গণদাবী

সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়া (কমিউনিস্ট)-এর বাংলা মুখপত্র (সাপ্তাহিক)

৬৪ বর্ষ ১৯ সংখ্যা ২৩ - ২৯ ডিসেম্বর, ২০১১ | প্রধান সম্পাদক ঃ রণজিৎ ধর | www.ganadabi.in | মূল্য ঃ ২ টাকা

বিষমদ ঃ ঘরে ঘরে কান্নার রোল

গ্রামে গ্রামে কোথাও কবরের পর কবর, কোথাওবা শ্মশানে সারি সারি চিতায় তোলা হচ্ছে মরদেহ। সামনে বুকভাঙা কান্নায় আছড়ে পড়ছেন উস্তি থানার সংগ্রামপুরের মানোয়ারা, সুখিয়া, রাবেয়া, মিরাতুনেরা, আবার মন্দিরবাজারের টেকপাঁজার শচী বর, পম্পা পাঁজা, মিনতি হালদারেরা। ভিড় করে রয়েছেন বেদনার্ত ও বিক্ষুব্ধ গ্রামবাসী। কোথাও মরদেহ ঘিরে দোয়া প্রার্থনার চিত্র, তো কোথাও হরিনাম সংকীর্তনে শেষ বিদায়ের প্রস্তুতি। আসছে আরও মানুষের মৃত্যুসংবাদ। মৃত্যু মিছিলের যেন কোনও শেষ নেই। ১২ ডিসেম্বর থেকে মগরাহাট, উস্তি ও মন্দিরবাজার থানা এলাকার গ্রামগুলির এই হল চেহারা।

১৫ ডিসেম্বর। উস্তি থানা এলাকার সংগ্রামপুর।

তোমার আব্বা কেমন আছেন? — গতকালই মারা গেছেন, চাচা মারা গেলেন একটু আগে।

আর তোমার আব্বা? — এই তো মাটি দিয়ে ফিরছি।

পারস্পরিক খোঁজখবর চলছিল এই ভাষাতেই।

ওই দিন মগরাহাট স্টেশনের সকাল হয়েছিল ডাব-নারকেল-সুপারি গাছ ছাড়ানোর মজুর হলুদবেড়িয়ার ইয়াসিন মোল্লার মৃতদেহ দেখে।

বেলা যত বেড়েছে ক্রমাগত বেড়ে চলেছে মৃতের সংখ্যা। কী ভয়ঙ্কর পরিস্থিতি! বাইরে থেকে

ছয়ের পাতায় দেখুন

সর্বদলীয় বৈঠকে কমরেড তরুণ নস্কর

মগরাহাটের বিষমদে অসংখ্য মানুষের মৃত্যুর ঘটনা নিয়ে ১৯ ডিসেম্বর বিধানসভায় সর্বদলীয় বৈঠককে স্বাগত জানিয়ে এস ইউ সি আই (সি) বিধায়ক কমরেড তরুণ নস্কর বলেন,

মাদকাসক্তি একটি সামাজিক ব্যাধি। বিগত

পাঁচের পাতায় দেখুন

সরকার কঠোর ব্যবস্থা নিক রাজ্য কমিটি

বিষ মদে শতাধিক মানুষের মৃত্যুতে শোক ও উদ্বেগ প্রকাশ করে রাজ্য সম্পাদক কমরেড সৌমেন বসু ১৫ ডিসেম্বর এক সাংবাদিক সম্মেলনে বলেন,

মগরাহাটে বিষ মদে শতাধিক মানুষের মর্মান্তিক মৃত্যুতে আমরা শোকাহত এবং অত্যন্ত উদ্বিগ্ন। চোলাই মদের বিষক্রিয়ায় এই ধরনের মৃত্যু এই প্রথম ঘটল তা নয়। গত ৩৪ বছরে সিপিএম-ফ্রন্ট সরকারের শাসনে বহু জায়গায় বহু বার এ জিনিস ঘটেছে। তারপর সব ধামাচাপা দেওয়া হয়েছে। সরকারি প্রশ্রয়ে ও নির্বাচনে পেশিশক্তি ব্যবহারের প্রয়োজনে চোলাই মদের কারবারি সমাজবিরোধীদের সঙ্গে শাসক দলের যোগসাজশে এ রাজ্যে মদের প্রসার ব্যাপকভাবে ঘটেছে। এই অবস্থায় বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী ১৯ ডিসেম্বর যে

চারের পাতায় দেখুন

আন্না হাজারের দুর্নীতিবিরোধী আন্দোলনকে স্বাগত জানাল কেন্দ্রীয় কমিটি

দুর্নীতির বিরুদ্ধে নতুন পর্যায়ে আন্দোলন শুরু করার জন্য আন্না হাজারের প্রচেষ্টাকে স্বাগত জানিয়ে এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর সাধারণ সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ, ১১ ডিসেম্বর এক বিবৃতিতে বলেন,

দুর্নীতির ক্রমবর্ধমান বিপদকে কার্যকরীভাবে প্রতিরোধ করার উদ্দেশ্যে আন্না হাজারের দেশব্যাপী দুর্নীতিবিরোধী আন্দোলনে আমাদের দল প্রথম থেকেই অংশ নিয়েছে। আমরা দৃঢ়ভাবে মনে করি, লোকপাল বিল সংক্রান্ত যে সুপারিশ পার্লামেন্টারি স্ট্যান্ডিং কমিটি পেশ করেছে, তা সংসদে সমস্ত সদস্যের দ্বারা সমর্থিত 'সেন্স অফ দ্য হাউস' প্রস্তাবের মূল বক্তব্যের পরিপন্থী এবং প্রধানমন্ত্রী নিজে এ বিষয়ে যে প্রতিশ্রুতি শ্রী হাজারেকে দিয়েছিলেন, এই সুপারিশে তারও খেলাপ করা হয়েছে। সর্বোপরি লোকপালের নজরদারির আওতা থেকে প্রধানমন্ত্রী, সাংসদ, নিচুতলার আমলা, বিচারবিভাগ এবং সি বি আইকে বাদ রাখতে বলার মধ্য দিয়ে সমগ্র দেশের জনগণের আকাঙ্ক্ষার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করা হয়েছে। আরও গুরুতর বিষয় হল, এই সুপারিশে লোকপালের তদন্ত করার ক্ষমতা কেড়ে নেওয়া হয়েছে। সরকারের সামগ্রিক আচরণ আমাদের এই পূর্ব আশঙ্কাকেই সত্য প্রমাণ করল যে, ক্রমবর্ধমান ও সর্বব্যাপক দুর্নীতি জনজীবনকে যতই দুর্বিষহ করে তুলুক, তাকে রুখবার জন্য সরকারের কোনও ইচ্ছাই নেই। এই পরিস্থিতিতে একেবারে নীচু স্তর থেকে জনগণকে যুক্ত করে শক্তিশালী আন্দোলন গড়ে তোলা ছাড়া আর কোনও বিকল্প পথ খোলা নেই। গণকমিটির মাধ্যমে জনগণকে সংগঠিত করতে ও এই কমিটির অধীনে স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী তৈরি করতে পারলে তা আন্দোলনকে স্থায়ী রূপ দিতে পারে এবং সরকারকে মানুষের কথা শুনতে বাধ্য করতে পারে।

আমরা মনে করি, একই সঙ্গে মূল্যবৃদ্ধি, বেকারি, জমি অধিগ্রহণ, খুচরো ব্যবসায় বিদেশি বিনিয়োগের মতো বিষয়গুলি জনসাধারণের

চারের পাতায় দেখুন

১৭ ডিসেম্বর কলকাতায় এসপ্ল্যানেড থেকে কলেজ স্কোয়ার পর্যন্ত ছাত্র-যুব-কিশোর-মহিলাদের মৌন মিছিল

সুন্দরবন ও আসামের রেল প্রকল্পগুলি দ্রুত শেষ করুন

সংসদে ডাঃ তরুণ মণ্ডল

রেল বাজেটে বাড়তি বরাদ্দের দাবির সমর্থনে, লোকসভার শীতকালীন অধিবেশনে এস ইউ সি আই (সি) সাংসদ ডাঃ তরুণ মণ্ডল বলেন, আমি সুন্দরবনের অত্যন্ত অনুন্নত একটি এলাকার প্রতিনিধিত্ব করি। পূর্বতন রেলমন্ত্রী এই এলাকায় কিছু নতুন রেলপ্রকল্প, যেমন সিঙ্গল লাইনকে ডবল করা, মিটার গেজকে ব্রডগেজে রূপান্তরিত করা, নতুন লাইন বসানো ইত্যাদির ঘোষণা করেছিলেন। নতুন রেলমন্ত্রীকে ঐ কাজগুলি দ্রুত করার জন্য অনুরোধ করছি। রেলওয়ে স্টেশনের লাগোয়া অঞ্চলে যেসব ভেন্ডর বা ছোট ব্যবসায়ী বা হকাররা নানা জিনিস বিক্রিবাটা করে জীবন নির্বাহ করেন, তাদের যথাযথ ক্ষতিপূরণ ও পুনর্বাসন না দিয়ে উচ্ছেদ করা হবে না বলে পূর্বতন রেলমন্ত্রী ও রেলদপ্তরের পক্ষে যে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল, আশা করব, বর্তমান রেলমন্ত্রী সেই প্রতিশ্রুতি রক্ষা করবেন।

কমরেড মণ্ডল আরও বলেন, শিয়ালদহ-লক্ষ্মীকান্তপুর-নামখানা লাইনে যাত্রীর সংখ্যা বিপুল। অথচ সংখ্যায় ট্রেন কম। ফলে ভিড়ের চাপ প্রবল। গঙ্গাসাগর মেলার যাত্রীরাও এই রুট ব্যবহার করেন। ফলে, এই রুটে ট্রেনের সংখ্যা বাড়ানো দরকার। কিছু শাটল ট্রেন চালানোর ব্যবস্থা করার জন্য আমি রেলমন্ত্রীকে অনুরোধ করছি। মুম্বইয়ের মফস্বল ট্রেন ব্যবস্থার মতো কলকাতার শহরতলির ট্রেন পরিষেবায় বিশেষ যাত্রীদের কথা বিবেচনা করে লোকাল ট্রেনে প্রথম শ্রেণির কামরা যুক্ত করার কথাও ভাবতে অনুরোধ করছি। অন্যান্য রাজ্যে এবং আমাদের রাজ্যেও কিছু হল্ট স্টেশন আছে, যেগুলি রক্ষণাবেক্ষণ করেন কন্ট্রাক্টররা। তাঁরাই টিকিট বিক্রি করেন। স্টেশন রক্ষণাবেক্ষণের যাবতীয় কাজও তারাই দেখেন। এদের বিষয়টিও সহানুভূতি ও মানবিকতার সাথে দেখা দরকার রেলদপ্তরের, যাতে তাঁদের জীবিকা চলে না যায়। তাঁদের সাথে রেলের চুক্তি যেন পুনর্নবীকরণ করা হয়।

ডাঃ মণ্ডল এরপর পূর্ব ভারতের আসাম-ত্রিপুরার সমস্যার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেন, শিলচর, লামডিং ও আগরতলায় লাইন মিটার গেজ থেকে ব্রডগেজে রূপান্তরিত করার কাজ গত ১৫ বছর ধরে ঝুলে রয়েছে। ঐসব অঞ্চলের মানুষের সাথে আমি একবার দেখা করেছি। তাঁরাও এই দাবি নিয়ে এসে দিল্লিতে যন্তরমন্তরে বিক্ষোভ দেখিয়েছেন। তাঁরা রেলবোর্ডের কর্তাব্যক্তিদের সাথেও দেখা করেছেন। সম্প্রতি তাদের এক প্রতিনিধি দল গৌহাটির মালিগাঁওয়ে রেলের জেনারেল ম্যানেজার (নির্মাণ)-এর সাথে দেখা করলে তিনি প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে, ২০১৩ সালের মধ্যে ওখানকার কাজ শেষ করা হবে। তিনি ঐসব অঞ্চলে কিছু আইনশৃঙ্খলার সমস্যার কথা বলেছেন, যেটা আসাম রাজ্য সরকারের দেখার বিষয়। এ জন্যই নাকি লাইন পরিবর্তনের কাজ এগোচ্ছে না। জনগণের ধারণা যে, সড়ক পরিবহনের সাথে যুক্ত প্রভাবশালী গোষ্ঠীরাই এই কাজে বাধা সৃষ্টি করছে। একইভাবে আগরতলাতেও ব্রডগেজে রূপান্তরের কাজ দ্রুত হওয়া দরকার। সুবরুম অঞ্চলে কাজ ঝুলে আছে, যেটা শেষ করা দরকার।

রেলযাত্রার নিরাপত্তা নিয়ে জনগণের আস্থা সম্প্রতি পরপর কয়েকটি দুর্ঘটনায় ঘা খেয়েছে। আমি দেখেছি, বিশেষ কিছু কারণ রয়েছে এইসব দুর্ঘটনার পিছনে, রেলমন্ত্রী সমস্যাগুলির প্রতি উপযুক্ত নজর দিলে যার সমাধান সম্ভব।

কমন এন্ট্রান্স টেস্টের প্রতিবাদে

ত্রিপুরায় ছাত্র বিক্ষোভ

সম্প্রতি কেন্দ্রীয় সরকার, রাজ্য স্তরে মেডিকেল শিক্ষার ক্ষেত্রে জয়েন্ট এন্ট্রান্স পরীক্ষা তুলে দিয়ে সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে একটিমাত্র পরীক্ষা 'কমন এন্ট্রান্স টেস্ট' নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এতদিন এই পরীক্ষা হত রাজ্য ভাষায়। ত্রিপুরা ও পশ্চিমবঙ্গের ছাত্রছাত্রীরা বাংলা ভাষায় এই পরীক্ষা দিতেন। এখন বাংলা ভাষার পরিবর্তে পরীক্ষাটি হবে ইংরেজি ও হিন্দিতে। দ্বিতীয়ত, যে পাঠ্যসূচির ভিত্তিতে পরীক্ষা নেওয়া হবে তার সঙ্গে রাজ্যের উচ্চমাধ্যমিক বোর্ডের পাঠ্যসূচির কোনও সাযুজ্য নেই। ফলে কেন্দ্রীয় সরকারের এই হঠকারী সিদ্ধান্ত ছাত্রদের মারাত্মক সমস্যায় ফেলবে। সাধারণ ছাত্রছাত্রীদের ডাক্তার হওয়ার পক্ষে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করবে। এই ব্যবস্থা মেডিকেল শিক্ষাকে বেসরকারিকরণ ও বাণিজ্যিকীকরণের দিকে নিয়ে যাবে। বিস্ময়কর হল, ত্রিপুরা সরকার মুখে রাজ্যভাষায় পরীক্ষা নেওয়ার কথা বললেও কেন্দ্রীয় সরকারের অনুসৃত সর্বনাশা সিদ্ধান্ত মেনে নিয়ে ১৩ মে ২০১২, রাজ্যে 'ন্যাশনাল এলিজিবল কমন এন্ট্রান্স' পরীক্ষার দিনক্ষণ ঘোষণা করেছে।

সরকারের ধারাবাহিক উদাসীনতায় ত্রিপুরায় সরকারি শিক্ষার পরিকাঠামো এবং মান ক্রমশ ভেঙে পড়েছে। সর্বশিক্ষা অভিযানের নামে প্রাথমিক শিক্ষার মান তলানিতে ঠেকেছে। প্রয়োজনীয় সংখ্যক শিক্ষকের অভাবে রাজ্যের শিক্ষাব্যবস্থা ধুঁকছে। এই অবস্থার মধ্যেও সরকারি স্কুলে গরিব-মধ্যবিত্ত ঘরের মেধাবী ছাত্রছাত্রীরা মেডিকেল শিক্ষায় প্রবেশ করার যতটুকু সুযোগ পেত, সর্বভারতীয় 'কমন এন্ট্রান্স টেস্ট' পরীক্ষার এই নীতি ত্রিপুরার সি পি এম সরকার মেনে নেওয়ায় তা চিরতরে বন্ধ হয়ে যাবে। শুধুমাত্র ব্যয়বহুল বেসরকারি স্কুলে পাঠরত ধনী ঘরের ছাত্রছাত্রীরাই মেডিকেল শিক্ষার সুযোগ গ্রহণ করতে পারবে। ফলস্বরূপ আগামী দিনে শিক্ষাব্যবসায়ীদের দ্বারা ব্যাপক হারে শিক্ষা ব্যবসা করার জন্য রাজ্যের আনাচে-কানাচে ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল গড়ে উঠবে।

এ আই ডি এস ও-র পক্ষ থেকে মেডিকেল শিক্ষা নিয়ে রাজ্য সরকারের দ্বিচারিতা এবং কেন্দ্রীয় সরকারের হঠকারী ছাত্র স্বার্থবিরোধী সিদ্ধান্ত বাতিল করে পূর্ববৎ রাজ্য ভিত্তিক জয়েন্ট এন্ট্রান্স পরীক্ষা চালুর দাবিতে ২৩ ডিসেম্বর আগরতলার বটতলায় এক ছাত্র বিক্ষোভ অনুষ্ঠিত হয়। বক্তব্য রাখেন এ আই ডি এস ও ত্রিপুরা রাজ্য কমিটির সম্পাদক কমরেড মৃদুল কান্তি সরকার এবং সভাপতি কমরেড অমর দেবনাথ।

মোটরভ্যান চালকদের উত্তর ২৪ পরগণা সম্মেলন

মোটরভ্যান চালকদের লাইসেন্স প্রদান, পুলিশ ও প্রশাসনের হয়রানি বন্ধ, বনগাঁ-বসিরহাট ও হাবড়া সহ বিভিন্ন পৌরসভায় পণ্যবাহী মোটরভ্যানের চলাচলে বিধিনিষেধ তুলে নেওয়া, প্রভিডেন্ট ফান্ড ও পেনশন স্কিম চালু এবং দুর্ঘটনা বিমা প্রকল্প চালু সহ সাত দফা দাবিতে 'সারা বাংলা মোটরভ্যান চালক ইউনিয়ন'-এর উত্তর ২৪ পরগণা জেলার চতুর্থ সম্মেলন বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনায় ২৮ নভেম্বর বারাসত বিদ্যাসাগর ভবনে অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে ১২৫০ জন মোটরভ্যান চালক জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে প্রতিনিধি রূপে উপস্থিত ছিলেন।

সম্মেলনের শুরুতে শহিদ বেদিতে মাল্যদান করেন ইউনিয়নের নেতৃবৃন্দ ও শ্রমিক প্রতিনিধিবৃন্দ। জেলা সম্পাদক জয়ন্ত সাহা সম্পাদকীয় প্রতিবেদন পাঠ করেন। শোকপ্রস্তাব পাঠ ও সম্মেলন পরিচালনা করেন সহসম্পাদক গৌতম দাস, সম্পাদকীয় প্রতিবেদনের উপর প্রতিনিধিরা আলোচনা করেন। বিশেষ অতিথি ও প্রধান বক্তা ছিলেন যথাক্রমে সংগঠনের রাজ্য সভাপতি সুজিত ভট্টশালী ও রাজ্য সম্পাদক অশোক দাস। আমন্ত্রিত অতিথি ছিলেন সারা ভারত কৃষক ও খেতমজুর সংগঠনের জেলা সভাপতি গোপাল বিশ্বাস। বক্তারা সংগঠনকে শক্তিশালী করে আন্দোলনের মাধ্যমে দাবিসমূহ আদায়ের আহ্বান রাখেন। পিয়ার আলিকে সভাপতি ও জয়ন্ত সাহাকে সম্পাদক করে একটি শক্তিশালী জেলা কমিটি গঠিত হয়।

সম্মেলনের শেষে প্রতিনিধিদের সুসজ্জিত মিছিল জেলাশাসকের দপ্তরের সামনে উপস্থিত হয়। জেলা সম্পাদকের নেতৃত্বে পাঁচজনের প্রতিনিধি দল দাবিগুলি তুলে ধরেন। জেলাশাসকের দপ্তর থেকে দাবিসমূহ পূরণের উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দেওয়া হয়।

নোদাখালিতে বিদ্যুৎগ্রাহক সম্মেলন

বারবার বিদ্যুতের মাশুল বৃদ্ধি এবং ঘন ঘন লোডশেডিংয়ের প্রতিবাদে ২৭ নভেম্বর দেড় শতাধিক বিদ্যুৎ গ্রাহকের উপস্থিতিতে অ্যাবেকার দক্ষিণ ২৪পরগণার নোদাখালি থানা শাখার দ্বিতীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় বাওয়ালী সাতগাছিয়া মহেশ্বরপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ে। সংগঠনের কলকাতা জেলা সম্পাদক সত্যেন ভট্টাচার্য বলেন, যেদিন বন্টন কোম্পানি বিদ্যুতের মাশুল বাড়ানোর কথা ঘোষণা করবে, তার পরের দিনই গ্রুপ সাপ্লাই অফিসে বিক্ষোভ কর্মসূচি সংগঠিত করতে হবে। এলাকার সমাজসেবী নিমাই চাঁদ সাঁতরা, শিক্ষক মৃত্যুঞ্জয় চক্রবর্তী ও শ্যামল পাত্র প্রমুখ অ্যাবেকার আন্দোলনকে সাহায্য করার কথা বলেন। সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের থানা শাখার সভাপতি নবীনচন্দ্র মণ্ডল। বিদায়ী সম্পাদক দেবব্রত ঘোষ বার্ষিক প্রতিবেদন পেশ করেন। মূল প্রস্তাব উত্থাপন করেন নবীন মণ্ডল। আগামী দিনের আন্দোলনের কর্মসূচি পেশ করেন বাসুদেব কাবড়ী। সর্বসম্মতিক্রমে পঁচিশ জনের কার্যকরী কমিটি নির্বাচিত হয়। সম্মেলনে অ্যাবেকার পক্ষ থেকে উপস্থিত ছিলেন শিলাজিৎ সান্যাল ও কাজল ভট্টাচার্য।

পার্টিকর্মীর জীবনাবসান

উত্তর ২৪ পরগণা জেলার হাবড়ার প্রবীণ কমরেড হরিপদ বণিক গত ২৬ নভেম্বর সকালে দীর্ঘ রোগভোগের পর ৭৯ বছর বয়সে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

কমরেড হরিপদ বণিক ৫০-এর দশকের মাঝামাঝি বৃহত্তর হাবড়া এলাকায় প্রয়াত কমরেড যোগেন দাসের মাধ্যমে দলের সংস্পর্শে আসেন। তারপর থেকেই তিনি এই এলাকায় দলের সংগঠন গড়ে তোলায় উদ্যোগী হন। এই প্রক্রিয়াতেই তিনি বসিরহাটেও দলের যোগসূত্র গড়ে তোলেন। তিনি তাঁর পরিবার পরিজনদেরও দলের আদর্শে প্রভাবিত করতে পেরেছিলেন। দলের কমরেডদের কাছে তাঁর বাড়ি ছিল অবারিত।

তাঁর মৃত্যুসংবাদ শোনার সাথে সাথেই রাজ্য কমিটির সদস্য কমরেড শংকর ঘোষ ও জেলা সম্পাদক কমরেড গোপাল বিশ্বাস সহ এলাকার কমরেডরা তাঁর বাড়িতে উপস্থিত হন এবং মরদেহে মাল্যদান করেন।

গত ৬ ডিসেম্বর হাবড়া পার্টি অফিসে তাঁর স্মরণে সভা অনুষ্ঠিত হয়। এলাকার প্রবীণ কমরেডদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন কমরেডস ভূপেন দাস, তপন বিশ্বাস, সুবোধ কুণ্ডু, প্রশান্ত দত্ত, কুমুদ দাস। তাঁরা প্রত্যেকেই প্রয়াত কমরেডের তত্ত্ব চর্চার প্রতি প্রবল আগ্রহের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করার পাশাপাশি বলেন, তাঁর হৃদয়বৃত্তি ছিল খুবই উচ্চমানের। যখনই কোনও কমরেড তাঁর কাছে গিয়েছেন, তাঁর হৃদয়ের উষ্ণতা অনুভব করেছেন। এছাড়াও বক্তব্য রাখেন কমরেড শিশির মিস্ত্রি ও কমরেড শংকর ঘোষ।

কমরেড হরিপদ বণিক লাল সেলাম

উচ্ছেদের বিরুদ্ধে ব্যবসায়ীদের মহাকরণ অভিযান

মধ্য কলকাতার বি বি গাঙ্গুলী স্ট্রিটে ইস্ট-ওয়েস্ট মেট্রো সেন্ট্রাল স্টেশন করার নামে ব্যাপক উচ্ছেদের বিরুদ্ধে ১৫ ডিসেম্বর মহাকরণ অভিযানের ডাক দেয় সেন্ট্রাল কলকাতা সিটিজেন ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন। কমিটির দাবি বি বি গাঙ্গুলী স্ট্রিটে নতুন সেন্ট্রাল স্টেশন না করে পূর্বতন উত্তর-দক্ষিণ মেট্রোর সেন্ট্রাল স্টেশনই ব্যবহার করা হোক। কমিটির প্রশ্ন, উত্তর-দক্ষিণ মেট্রোর স্টেশন থাকা সত্ত্বেও তার কাছেই পূর্ব-পশ্চিম কলকাতা মেট্রোর জন্য নতুন স্টেশনের প্রয়োজন কোথায়?

আন্দোলনকারীরা পূর্ব-পশ্চিম মেট্রোকেও ভারতীয় রেলের অধীনে দেওয়ার দাবি তুলেছেন। এস ইউ সি আই (সি) সাংসদ ডাঃ তরুণ মণ্ডলের মাধ্যমেও ইতিপূর্বে পূর্বতন রেলমন্ত্রী বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জীর কাছে এই প্রস্তাব রাখা হয়েছে। উত্তর কলকাতার সাংসদ সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় সংসদে একই প্রস্তাব তোলেন। মমতা ব্যানার্জী বলেছিলেন যাতে অন্যায়ভাবে উচ্ছেদ না হয় সেটা সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় দেখবেন। কিন্তু লক্ষ করা যায়, জমি অধিগ্রহণ দপ্তর থেকে পর পর উচ্ছেদের নোটিশ আসছে। এই অবস্থায় কমিটি মহাকরণ অভিযানের কর্মসূচি গ্রহণ করে। কয়েক হাজার মানুষের মিছিল লালবাজারের সামনে পৌঁছলে পুলিশ মিছিলের গতিরোধ করে। সেখানেই শুরু হয় বিক্ষোভ সভা। আন্দোলনকারীদের সংগ্রামী মনোবল লক্ষ করে প্রশাসনের পক্ষ থেকে মুখ্যমন্ত্রীর সচিবালয়ের সাথে আলোচনার জন্য চারজনের প্রতিনিধি দলকে যেতে দেওয়া হয়। মুখ্যমন্ত্রীর সচিব প্রতিনিধিদের বক্তব্য মুখ্যমন্ত্রীকে জানানোর আশ্বাস দেন। অবরোধ চলাকালীন বক্তব্য রাখেন কমিটির সাধারণ সম্পাদক জি পি সিং, সভাপতি কামাল আহমেদ, যুগ্মসম্পাদক সমর দত্ত, কোষাধ্যক্ষ সুনীল ঝাওয়ার এবং এস ইউ সি আই (সি) কলকাতা জেলা কমিটির সদস্য আয়সানুল হক।

১৫ ডিসেম্বর গোসাবা হাসপাতালে মহিলা ও যুবকদের বিক্ষোভ

শরৎচন্দ্র থেকে শিখতে হবে সাংবাদিকদের
বললেন প্রেস কাউন্সিলের চেয়ারম্যান

অনেকদিন থেকেই কথাটা উঠছিল যে, সংবাদমাধ্যম তার দায়িত্বপালনের জায়গা থেকে সরে আসছে। সত্যনিষ্ঠা, নিরপেক্ষতা এবং বস্তুনিষ্ঠ সংবাদ পরিবেশনের পরিবর্তে মুখরোচক সংবাদ পরিবেশন, তিলকে তাল করা, গুরুত্বপূর্ণ সংবাদকে গুরুত্বহীন করে দেখানো, উত্তেজক আকারে পরিবেশন করার দিকে ঝুঁকে পড়ছে। সেই কথাগুলি জোরের সাথে বললেন, স্বয়ং প্রেস কাউন্সিলের চেয়ারম্যান বিচারপতি মার্কণ্ডেয় কাটজু। তিনি বলেছেন, "সংবাদমাধ্যম দারিদ্র, বেকারি, পণজনিত মৃত্যু প্রভৃতির মতো সমাজের প্রধান ব্যাধিগুলি নিয়ে গভীরে চর্চা করে না। পরিবর্তে তাদের প্রচারের ৯০ শতাংশই বিনোদনের জন্য ব্যয় করে। যখন দেশে শত শত চাষি ফসলের ন্যায্য মূল্য না পেয়ে ঋণ জর্জরিত অবস্থায় আত্মহত্যা করছে, তখন সংবাদমাধ্যমগুলি দেব আনন্দের মৃত্যু সংবাদ প্রথম পাতায় ছাপছে।" বিচারপতি কাটজু কথাগুলি বলেছেন ৫ ডিসেম্বর, কলকাতায় 'সংবাদমাধ্যমের ভূমিকা' শীর্ষক এক আলোচনায়।

বাস্তবিক বিনোদনের নামে অধিকাংশ সংবাদমাধ্যম যা পরিবেশন করে চলেছে তা যেমন নিম্ন মানের, তেমনই স্থূল। ফিল্মস্টারদের ব্যক্তিগত জীবন, ফ্যাশন প্যারেড, স্বল্পবাস নারী-পুরুষের বিচিত্র অঙ্গভঙ্গির নাচ, পপ মিউজিক, উগ্র হিংস্রতা ও যৌনতাই এই ধরনের বিনোদনের প্রতিপাদ্য বিষয়। চ্যানেলের পর চ্যানেল জুড়ে চলে চূড়ান্ত অবৈজ্ঞানিক, লোকঠকানো জ্যোতিষ চর্চা। এ সবের বিরুদ্ধে সাংবাদিকদের এগিয়ে আসার জন্য বিচারপতি কাটজু আহ্বান জানিয়েছেন। বলেছেন, "আমাদের দেশের ৯০ শতাংশ মানুষের চেতনার মান খুব নিচু। সমাজের বিভিন্ন বিষয়ের খবর পরিবেশন করে মানুষকে জাগিয়ে তুলতে হবে। এই মান বৃদ্ধিতে সাংবাদিকদের নেতৃত্বকারী ভূমিকা রয়েছে।" তিনি বলেছেন, "সংবাদমাধ্যম নিশ্চয় কিছু বিনোদন প্রচার করবে কিন্তু তার প্রচারের কেন্দ্রে সব সময়ই থাকবে জনস্বার্থ। কিন্তু এ ব্যাপারে সংবাদমাধ্যমের মাত্রাজ্ঞান থাকছে না।" এ প্রসঙ্গে তিনি সাহিত্যিক শরৎচন্দ্রের দৃষ্টান্ত তুলে ধরে তাঁর থেকে শেখার কথা বলেছেন। শরৎচন্দ্র তাঁর সাহিত্যে যে অপূর্ব রসসৃষ্টি করেছেন, যা পাঠককে সুনির্মল আনন্দ দেওয়ার সাথেই তাঁদের চেতনার মান এবং উন্নত রুচি গড়ে তুলতে সহায়তা করে, আজকের সাংবাদিকদেরও সেই ভূমিকাই নেওয়ার কথা বলেছেন তিনি। তিনি বলেছেন, শরৎচন্দ্র যেভাবে তাঁর লেখার মধ্য দিয়ে জাতপাত এবং মহিলাদের উপর সমস্ত রকম নিপীড়নের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছিলেন, আজ সাংবাদিকদেরও তেমনই সামাজিক নানা অনাচারের বিরুদ্ধে সোচ্চার হতে হবে। কিন্তু সাংবাদিকরা কী করে এই কাজ করবেন যদি তাঁদের নিজেদের চেতনার মানই নিচু হয়! এ জন্য তিনি সাংবাদিকদের অতি যত্নের সাথে সমাজবিজ্ঞান, ইতিহাস এবং সাহিত্য চর্চা করার কথা বলেন। তিনি বলেন, আমি মনে করি বিশ্বের শ্রেষ্ঠ লেখকদের মধ্যে শরৎচন্দ্র অন্যতম। মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জীর উদ্দেশে বলেছেন, তাঁর উচিত শরৎচন্দ্রকে 'মরণোত্তর ভারতরত্ন' দেওয়ার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে আবেদন করা।

বিচারপতি কাটজু মিডিয়া মালিকদের রুচিহীন প্রচার এবং একপেশে সংবাদ পরিবেশন নীতির বিরোধিতা করে বলেছেন, "এর দ্বারা তাঁরা শেষপর্যন্ত সংবাদমাধ্যমের মানেরই অধঃপতন ঘটাচ্ছেন।" তিনি বলেছেন, "সংবাদমাধ্যম কখনওই আর পাঁচটা ব্যবসার মতো নয়, তার কারবার পণ্য নিয়ে নয়, আইডিয়া নিয়ে।" সংবাদমাধ্যমের এই গুরুত্বপূর্ণ দিককেই আজ ভুলিয়ে দেওয়ার চেষ্টা চলছে। অথচ এই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার জন্যই সংবাদমাধ্যমকে এক সময় 'ফোর্থ এস্টেট' হিসাবে বলা হয়েছিল। বলা হয়েছিল 'গণতন্ত্রের প্রহরী'। বুর্জোয়া সংবাদমাধ্যম আজ নিজেই তার সেই ভূমিকাকে অগ্রাহ্য করছে এবং এইভাবে তার বিশ্বাসযোগ্যতাও হারাচ্ছে। এই 'আইডিয়া'র প্রশ্নেই শরৎচন্দ্র সম্পর্কে তাঁর বক্তব্য গুরুত্বপূর্ণ। এই আইডিয়া মানে চিন্তার গভীরতা, চেতনার উচ্চমান, উন্নত আদর্শ। শরৎচন্দ্র তাঁর সমস্ত গল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধতেই এই আইডিয়ার চর্চাই করেছেন। সমাজের প্রধান ব্যাধিগুলির কথাই তাঁর লেখায় তুলে ধরেছেন। সংবাদমাধ্যম বিচারপতি কাটজুর এই বক্তব্যের গুরুত্ব অনুধাবন করবে কি না, বা কতজন সাংবাদিক তা অনুসরণ করবেন তা নিয়ে সন্দেহের যথেষ্ট অবকাশ আছে। কারণ, প্রায় সমস্ত বাংলা খবরের কাগজই তাঁর এই বক্তব্যকে 'ব্ল্যাক আউট' করেছে।

কেন এ ভাবে ব্ল্যাক আউট করা হল?

পরে তিনি এক ব্যক্তিগত আলোচনায় বলেন, আমি মনে করি একমাত্র শরৎচন্দ্রের লেখাতেই যথার্থ ভারতের পরিচয় রয়েছে। আরও অনেক নামকরা লেখক রয়েছেন, কিন্তু তাঁদের কারও লেখাতেই এমন করে দেশের মানুষের যথার্থ রূপটি ফুটে ওঠেনি। তিনি অভিযোগের সুরে বলেন, বাঙালি 'ইন্টেলেকচুয়ালরা' শরৎচন্দ্রকে কার্যত অবহেলা করেছেন। বিচারপতি কাটজু যথার্থই বলেছেন। বাংলার ইন্টেলেকচুয়ালদের একাংশ হয় শরৎচন্দ্রকে বোঝার মতো দৃষ্টিভঙ্গি অর্জন করতে পারেননি, অথবা সাহিত্যিক হিসাবে শরৎচন্দ্রের তুলনায় নিজেরা এত ক্ষুদ্র যে তা ঢাকতেই এই অবহেলার ভাব দেখিয়েছেন। যথার্থ ইন্টেলেকচুয়ালরা শরৎচন্দ্রকে অবহেলা করেননি, যোগ্য মর্যাদাই দিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, "আধুনিক লেখকরা শরৎচন্দ্রেরই পথের অনুসারী ... একদিন তারা সে কথা ভুলবে এবং তাকে স্বীকার করতে চাইবে না। কিন্তু আশা করি পাঠকেরা ভুলবে না (প্রবাসী, আশ্বিন, ১৩৩৮)। সুভাষচন্দ্র বলেছেন, 'একাধারে তিনি ছিলেন একজন আদর্শ লেখক, আদর্শ দেশপ্রেমিক ও সর্বোপরি আদর্শ মানব'। ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে অন্যতম খ্যাতনামা ইন্টেলেকচুয়াল মানবেন্দ্র নাথ রায় 'শেষ প্রশ্ন' নোবেল পাওয়ার যোগ্য বলে মনে করেছিলেন। নজরুল বলেছেন, 'অবমাননার অতল গহ্বরে যে মানুষ ছিল লুকায়ে, শরৎ-চাঁদের জ্যোৎস্না তাদের দিলো রাজপথ দেখায়ে'। এ ছাড়া বিভূতিভূষণ, তারাশঙ্কর, প্রেমেন্দ্র মিত্র সকলেই তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করেছেন। এ যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মার্কসবাদী চিন্তানায়ক শিবদাস ঘোষ বলেছেন, ভারতবর্ষে যখন রেনেশাঁস আন্দোলন চলছে, তখন তার পরিপূরক সাহিত্য সৃষ্টির ক্ষেত্রে শরৎচন্দ্রই সবচেয়ে অগ্রণী ভূমিকা, সকলের চেয়ে প্রগতিশীল ভূমিকা পালন করেছেন। তিনি বলেছেন, শরৎচন্দ্রকে যাঁরা অবহেলা করেছেন, তাঁরা মানবতাবাদের সর্বোচ্চ ভাবনাধারণা ও রুচি-সংস্কৃতির যে সূক্ষ্মতম কারবার তাকেই অনুধাবন করতে পারেননি। এমনকী যাঁরা আজ উচ্চ সংস্কৃতি, বিপ্লবাত্মক সংস্কৃতির চর্চা করছেন বা করবেন বলে মনস্থ করেছেন তাঁদের উদ্দেশে বলেছেন, কমিউনিস্টদের এগোতে হলে শরৎচন্দ্রকে আত্মস্থ করতেই হবে।

আসলে শরৎচন্দ্রকে ভুলিয়ে দিতে চেয়েছে এ দেশের পুঁজিপতি শ্রেণি। তারা বুঝেছিল, শরৎ সাহিত্যের চর্চা এ দেশের সাধারণ মানুষের মধ্যে, ছাত্র-যুবদের মধ্যে যে রুচি-সংস্কৃতির জন্ম দেবে তা বিপ্লবাত্মক। পরাধীন যুগে শরৎসাহিত্য ব্রিটিশ বিরোধী মনোভাব গড়ে তুলতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিল, স্বাধীন দেশেও তা শেষপর্যন্ত এই শোষণমূলক পুঁজিবাদী ব্যবস্থার বিরুদ্ধেই যাবে। তাই শরৎসাহিত্য স্বাধীন দেশেও ন্যূনতম রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতা থেকে সবসময় বঞ্চিত হয়েছে। কিন্তু মেঘ যেমন সূর্যকে বেশিক্ষণ আড়াল করে রাখতে পারে না, তেমনই দেশের মানুষের থেকে তারা শরৎচন্দ্রকে আড়াল করে রাখতে পারেনি। শরৎচন্দ্র স্থান করে নিয়েছেন দেশের মানুষের হৃদয়ের গভীরে।

বিচারপতি কাটজুকে ধন্যবাদ। তিনি শরৎসাহিত্যের মূল্য বুঝেছেন এবং শরৎচন্দ্র থেকে শিক্ষা নেওয়ার জন্য সাংবাদিকদের আহ্বান জানিয়েছেন। পুঁজিপতিদের অর্থে পরিচালিত সংবাদমাধ্যম এর যথার্থ মূল্য বুঝলে সংবাদ মাধ্যমের হৃত গৌরবই কিছুটা হলেও পুনরুদ্ধার সম্ভব হবে।

মদের ঠেক ভাঙার দাবিতে থানায় বিক্ষোভ

মদের ঠেক ভাঙার দাবিতে ১৭ ডিসেম্বর পাঁচ শতাধিক ছাত্র-যুব-মহিলা এ আই এম এস এস, এ আই ডি ওয়াই ও এবং এ আই ডি এস ও-র নেতৃত্বে জয়নগর থানায় বিক্ষোভ দেখায় এবং ডেপুটেশন দেয়। অল ইন্ডিয়া ডি ওয়াই ও-র জেলা কমিটির সদস্য কমরেড সুমন্ত গাঙ্গুলীর নেতৃত্বে ৭ জনের প্রতিনিধি দল ওসি-র সঙ্গে ৬ দফা দাবি সম্বলিত স্মারকলিপি জমা দিলে তিনি অতি দ্রুত চোলাই মদের ঠেক ভাঙার আশ্বাস দেন। ডেপুটেশন চলাকালীন থানার বাইরে বিক্ষোভ সমাবেশে বক্তব্য রাখেন কমরেড সোমনাথ পাল, ইলিয়াস মোল্যা, মৃন্ময়ী শাসমল, শুভেন্দু মণ্ডল প্রমুখ। এ আই এম এস এসের রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড সুজাতা ব্যানার্জীও বক্তব্য রাখেন। এরপর বিক্ষোভ মিছিল জয়নগর জি আর পি ক্যাম্পে পৌঁছায়। জি আর পি আধঘণ্টার মধ্যে সব স্টেশনের ভাঁটি ভাঙার আশ্বাস দিলে কমরেড মাধবী প্রামাণিক ও কমরেড দেবব্রত দাসের নেতৃত্বে প্রতিনিধি দল স্টেশন মাস্টারের কাছে যায়, যাতে তিনি স্টেশন চত্বরকে মদমুক্ত করতে ও অসামাজিক কাজকর্ম বন্ধ করতে ডি আর এমকে সবিশেষ জানান। যাত্রীরা এই আন্দোলনের প্রতি অকুণ্ঠ সমর্থন জানান। ঘণ্টা দুয়েক পর দক্ষিণ বারাসত ও জয়নগর স্টেশনে মদের ঠেক ভাঙা শুরু হয় এবং পর্যায়ক্রমে সব স্টেশনে ঠেক ভাঙার হবে বলে প্রশাসনের তরফ থেকে জানানো হয়েছে।

মানবাধিকার দিবসে সেমিনার

১০ ডিসেম্বর আন্তর্জাতিক মানবাধিকার দিবসে সিপিডিআরএস-এর হুগলী জেলা শ্রীরামপুর মহকুমা কমিটির উদ্যোগে শ্রীরামপুর উচ্চবিদ্যালয়ে একটি সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। বিষয় ছিল 'মানবাধিকার দমনে রাষ্ট্রের ভূমিকা।' সভাপতিত্ব করেন কমিটির সভাপতি সুব্রত বসু। কমিটির সম্পাদক তপন চৌধুরী সেমিনারের বিষয় ব্যাখ্যা করেন। অন্যান্য বক্তারা ছিলেন কমিটির সহসম্পাদক সমীরণ বসু ও অম্বিকা মান্না। প্রধান বক্তা ছিলেন সংগঠনের রাজ্য কমিটির সহসভাপতি সদানন্দ বাগল। তিনি মানবাধিকার নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন। সীমা বর্ধনের সঙ্গীত দিয়ে সভার কাজ শেষ হয়।

মদের প্রসারের বিরুদ্ধে
সবং-এ মহিলা সম্মেলন

১১ ডিসেম্বর সারা ভারত মহিলা সাংস্কৃতিক সংগঠনের উদ্যোগে প্রবল উৎসাহ উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে সবং থানার নারায়ণগড় প্রাথমিক বিদ্যালয়ে আঞ্চলিক মহিলা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। মদের প্রসার, পণপ্রথা, বধূহত্যা, দ্রব্যমূল্যবৃদ্ধি, নারী পাচার, নারী নির্যাতন প্রভৃতির বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান জানায় এই সম্মেলন। সম্মেলনে উত্থাপিত মূল প্রস্তাবের উপর বক্তব্য রাখেন সোমা বেরা, উমা মান্না, সাথি বেরা প্রমুখ। সম্মেলন পরিচালনা এবং বর্তমান সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে মহিলাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্বন্ধে আলোচনা করেন জয়শ্রী চক্রবর্তী ও ঝর্ণা জানা। উমা মান্নাকে সম্পাদিকা, সোমা বেরাকে সহ সম্পাদিকা এবং সন্ধ্যা প্রামাণিককে সভানেত্রী করে ১২ জনের আঞ্চলিক কমিটি গঠিত হয়।

কোচবিহারে ক্ষুদিরামের ব্রোঞ্জ মূর্তি স্থাপনের উদ্যোগ

মূর্তি জীবন্ত হয়ে উঠতে পারে। বিশেষ করে সেই মূর্তি যদি হয় ক্ষুদিরাম বসুর, তা হলে চোখের সামনে ভেসে ওঠে ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের এক গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়। সেই বিপ্লবী ক্ষুদিরাম বসুর ব্রোঞ্জ মূর্তি স্থাপনের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন কোচবিহারের নাগরিকরা। 'ক্ষুদিরাম স্মৃতিরক্ষা কমিটি উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় গ্রন্থাগারের সামনে ইতিপূর্বে যে মূর্তিটি স্থাপন করেছে সেখানেই স্থাপিত হবে এই ব্রোঞ্জ মূর্তি। ২০১৩ সালের ৩ ডিসেম্বরের মধ্যে কাজ শেষ করার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারিত হয়েছে। এই মূর্তি পথচলতি মানুষের কাছে গণমুক্তির অসমাপ্ত কাজ সমাপ্ত করার ঐতিহাসিক দাবিকে বাঙ্ময় করে তুলবে।

গত ৩ ডিসেম্বর ক্ষুদিরাম মূর্তির পাদদেশে আলোচনা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজন করে কমিটি। 'একবার বিদায় দে মা ঘুরে আসি' — মধুছন্দা বর্মনের কণ্ঠে এই গানটি গোটা এলাকাকে বেদনা ও প্রত্যয়ে ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত করে তোলে। ক্ষুদিরামের বিপ্লবী জীবন থেকে শিক্ষণীয় বিষয় প্রসঙ্গে আলোচনা করেন সারা বাংলা ক্ষুদিরাম আত্মোৎসর্গ কমিটির অন্যতম সদস্য অমল মাইতি। কমিটির সভাপতি প্রবীণ নাগরিক সত্যেন ঘোষ, সহ সভাপতি সৌমেন্দ্র দাস, সম্পাদক চন্দন চৌধুরী, প্রবীণ নাগরিক অমলেশ ভট্ট প্রমুখদের এই উদ্যোগ একটা ইতিহাসকে জীবন্ত করে রাখবে।

লন্ডন মানে কী কিছু আলো ঝলমলে পার্ক?

বহুবার বহু বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডের সাক্ষী এই শহর কলকাতা। নন্দরাম মার্কেট, স্টিফেন কোর্টের পর আগুনের উন্মত্ত তাণ্ডবে আবারও প্রাণ গেল আমরি হাসপাতালের ৯৩ জন অসহায় রোগীর। এর আগে সিপিএম ফ্রন্ট সরকারের আমলে একের পর এক দুর্ঘটনা ঘটেছে, মৃত্যু হয়েছে মানুষের। আর ক্ষমতাসীন মন্ত্রী-নেতাদের মুখে শোনা গেছে আশ্বাসের পর আশ্বাস। শোনা গেছে 'ক্রাইসিস ম্যানেজমেন্ট' (সংকটজনক পরিস্থিতির মোকাবিলা ব্যবস্থা), ট্রমা কেয়ার সেন্টার (দুর্ঘটনায় মানসিক আঘাত প্রাপ্তদের শুশ্রূষার কেন্দ্র) 'আধুনিকীকরণ' ইত্যাদি গালভরা শব্দবন্ধ, কিন্তু সে সবই শূন্যে মিলিয়ে গেছে। কাজের বেলায় কোনও কিছুরই দেখা মেলেনি। দমকল থেকে শুরু করে বিপর্যয় মোকাবিলায় দায়িত্বপ্রাপ্ত সরকারি কোনও সংস্থাই উপযুক্ত কর্মদক্ষতার পরিচয় দিতে পারেনি।

ইতিমধ্যে রাজ্যে সরকারের পরিবর্তন হয়েছে। তৃণমূল কংগ্রেস সরকারি ক্ষমতায় বসেছে। মুখ্যমন্ত্রী কলকাতা শহরকে ঘিরে তাঁর স্বপ্নের কথা শুনিয়েছেন রাজ্যবাসীকে। বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী ও পূর্বতন মুখ্যমন্ত্রীর মতো বলেছেন, কলকাতাকে তিনি 'লন্ডন' বানাতে চান। এই পরিস্থিতিতেই ঘটে গেল আমরি হাসপাতালের এই ভয়াবহ বিপর্যয়। দেখা গেল, বিপর্যয় সামাল দেওয়ার ক্ষেত্রে শুধু যে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের গাফিলতির কোনও সীমা-পরিসীমা নেই তাই নয়, দমকল তথা পুলিশবাহিনীও দাঁড়িয়ে আছে সেই অদক্ষতার অতল গহ্বরেই। হাসপাতালের নিরাপত্তা ব্যবস্থা খতিয়ে দেখা ও তার ভিত্তিতে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়ার ক্ষেত্রে চূড়ান্ত প্রশাসনিক গাফিলতির বিষয়টিও সামনে এসেছে।

যে লন্ডন শহরের আদলে কলকাতাকে ঢেলে সাজাবার কথা বলা হচ্ছে, হাসপাতাল বিপর্যয় মোকাবিলায় সেই লন্ডনের হাল কেমন? সেখানকার 'ন্যাশনাল হেলথ সার্ভিস' ২০০৮-এর জানুয়ারি থেকে ২০০৯-এর ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত পাঁচটি হাসপাতালে অগ্নিকাণ্ডে উদ্ধারকার্য সম্পর্কে একটি রিপোর্ট প্রকাশ করেছে। তাতে দেখা যাচ্ছে, ন্যাশনাল হেলথ সার্ভিসের অন্তর্গত হাসপাতালগুলিতে আগুন লাগার সঙ্গে সঙ্গে অত্যন্ত তৎপরতার সঙ্গে অসাধারণ দক্ষতায় বিপর্যয়-মোকাবিলা-কর্মীরা রোগীদের অক্ষত অবস্থায় উদ্ধার করার মতো কঠিন কাজটি সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করেছেন। সংস্থার প্রধান কার্যনির্বাহক রুথ কার্নাল মন্তব্য করেছেন, ২০০৮-০৯ এর ঘটনাবলীর মধ্য দিয়ে প্রমাণিত হয়েছে, যৌথভাবে কাজ করার সুষ্ঠু প্রক্রিয়া, সঠিক নেতৃত্ব ও পরিকল্পনা থাকলে আগুন লেগে যাওয়া হাসপাতাল থেকে রোগীদের উদ্ধার করা আদৌ অসম্ভব নয়। তিনি বলেছেন, এন এইচ এস-এর অন্তর্গত হাসপাতালগুলির প্রতিটিতে আগে থাকতেই বিপর্যয় মোকাবিলার মহড়া দেওয়া রয়েছে। ফলে হঠাৎ বিপদের সামনে পড়ে গেলেও হাসপাতালের নিরাপত্তা রক্ষী সহ অন্যান্য কর্মীরা হতচকিত হয়ে যাননি, ঠাণ্ডা মাথায় উদ্ধারকার্য চালিয়েছেন।

রিপোর্টে রয়্যাল মার্সডেন হসপিটালের অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা উল্লেখ করা হয়েছে। ২০০ রোগী বিশিষ্ট এই হাসপাতালের ছাদে যখন আগুন লাগে তখন অপারেশন থিয়েটারে ছিলেন তিন জন রোগী, ইন্টেন্সিভ কেয়ারে ছিলেন ছ'জন। এই অবস্থায় ১৫০ জন আপৎকালীন পরিষেবা কর্মী প্রতিটি রোগীর নিরাপত্তা সুনিশ্চিত রেখে মাত্র ২৮ মিনিটে গোটা হাসপাতাল বিল্ডিংটি খালি করে ফেলতে সমর্থ হয়েছিলেন।

গ্রেট আর্মড স্ট্রিট হসপিটালের কার্ডিওলজি বিভাগে আগুন লেগেছিল। ধোঁয়া ছড়িয়ে পড়েছিল আশেপাশের ওয়ার্ডগুলিতেও। দুর্ঘটনার ২ মিনিটের মধ্যে হার্ট ও শ্বাসপ্রশ্বাসের সমস্যা নিয়ে ভর্তি থাকা ২৩টি বাচ্চাকে নিরাপদে বাইরে বের করে এনেছিলেন হাসপাতালের কর্মীরা। দমকল হাজির হয়েছিল আগুন লাগার ছ'মিনিটের মাথায়। কীভাবে এত তৎপরতায় উদ্ধারকার্য সম্পন্ন করতে পারলেন লন্ডনের হাসপাতালগুলির কর্মীরা? আসলে এ ধরনের ঘটনা ঘটলে কী করে তা সুষ্ঠুভাবে মোকাবিলা করতে হবে, এ বিষয়ে সমস্ত কর্মীদের আগে থাকতেই ট্রেনিং দেওয়া হয়েছিল।

আগুন লাগার সময়ে লন্ডনের নর্থউইক পার্ক হাসপাতালের ৯৫ শতাংশ শয্যায় রোগীরা ভর্তি ছিলেন। ১০তলা হাসপাতাল বাড়িটি ধোঁয়ায় ভরে গিয়েছিল। এই অবস্থায় ২৩ মিনিটের মাথায় গোটা হাসপাতাল খালি করে ফেলা গিয়েছিল। নিরাপদে রোগীদের বের করে এনে তাঁদের জন্য যথাযথ চিকিৎসার ব্যবস্থাও করা হয় অতি দ্রুত। এঁদের মধ্যে ছিলেন বেশ কয়েকজন চলৎশক্তিহীন রোগীও।

এন এইচ এস-এর রিপোর্টে উল্লেখিত প্রতিটি ঘটনার ক্ষেত্রেই দেখা গেল, প্রতিটি হাসপাতালই বিপর্যয় মোকাবিলায় যথেষ্ট আন্তরিক। প্রত্যেক ক্ষেত্রেই অগ্নিকাণ্ড বা এ ধরনের দুর্ঘটনা ঘটলে কী করণীয়, সে বিষয়ে প্রতিটি কর্মীকেই আগে থেকে ট্রেনিং দেওয়া হয়েছে এবং কর্মীরা সহ হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ — সকলেই দুর্ঘটনাগ্রস্ত রোগীদের নিরাপদে স্থানান্তরিত করার বিষয়টিকে অবশ্যকর্তব্য বলে গণ্য করেছেন। আমরি হাসপাতালের সাম্প্রতিক অগ্নিকাণ্ডে প্রায় শত মানুষের মর্মান্তিক মৃত্যু প্রমাণ করে দিল, কলকাতার এই নামডাকওয়ালা হাসপাতালটিতে দুর্ঘটনা মোকাবিলার আবশ্যিক প্রস্তুতির ছিটেফোঁটা তো ছিলই না, উপরন্তু হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ সময় মতো দমকলকে খবর দেওয়ার জরুরি কাজটুকুও করেনি, অসহায় রোগীদের উদ্ধারে ছুটে আসা স্থানীয় যুবকদের ঢুকতে পর্যন্ত দেয়নি। আগুন নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষও উধাও হয়ে গিয়েছিল।

মানুষের জীবনরক্ষার এই মৌলিক দিকগুলির দিকে নজর না দিয়ে কলকাতাকে লন্ডন করার নামে কিছু পার্ক, চকচকে কিছু রাস্তাঘাট ও নদীর ধারে বাহারি আলোর ব্যবস্থা করার দ্বারা মিথ্যা নকলনবিশি হয়তো করা যাবে, প্রিয় এই শহর কলকাতার গালে হয়তো মাখানো যাবে কৃত্রিম প্রসাধনীর রঙ, কিন্তু তার অন্তরাত্মা থেকে যাবে অসুস্থতায় জীর্ণ, দুর্বলতায় ক্লিষ্ট। (সূত্র ঃ হিন্দুস্তান টাইমস, ১২-১২-১১)

টোডিদের সমস্ত দুর্নীতির তদন্ত চাই

বিধানসভায় অধ্যাপক তরুণ নস্কর

"আমরি কাণ্ড প্রমাণ করে বেসরকারি স্বাস্থ্যের কারবারিদের মুনাফার তীব্র লালসা কীভাবে এতগুলো অসহায় প্রাণের বলির কারণ হয়ে উঠতে পারে।" ১৩ ডিসেম্বর বিধানসভায় এ কথা বলেন, এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট) বিধায়ক অধ্যাপক তরুণ নস্কর। এই বীভৎস ঘটনায় ৯৩ জনের মর্মান্তিক মৃত্যু ঘটেছে। নিরাময় পলিক্লিনিকে সুলভ চিকিৎসার সুযোগ বন্ধ করে সেটি যেভাবে জলের দামে টোডিদের হাতে তুলে দিয়েছিল পূর্বতন সিপিএম সরকার তার উল্লেখ করে বিধায়ক তরুণ নস্কর বলেন, "কেবলমাত্র ঢাকুরিয়া ইউনিটই নয়, সল্টলেক থেকে শুরু করে কলকাতার বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চলে কীভাবে ঐ গোষ্ঠীকে জমি পাইয়ে দেওয়া হয়েছিল, কেমন করে অগ্নিকাণ্ড সমেত নিরাপত্তাজনিত আরও নানা বিষয়কে চূড়ান্ত অবহেলা করা সত্ত্বেও এই কারবারিদের ফুলে ফেঁপে উঠতে সাহায্য করা হয়েছিল তারও তদন্ত আজ জরুরি।" তিনি মুখ্যমন্ত্রীর বিচারবিভাগীয় তদন্ত ঘোষণাকে স্বাগত জানিয়ে বলেন, "স্টিফেন কোর্টের ঘটনায় দোষী ব্যক্তিদের দ্রুত জামিন পেতে অসুবিধা হয়নি। প্রকাশিত সংবাদ অনুযায়ী অতীতের এমন তদন্ত কমিশনগুলি বাস্তবে কোনও কার্যকর ভূমিকা নিতে পারেনি। এবার যেন তারই পুনরাবৃত্তি না হয়।" পরিশেষে তিনি সরকারি হাসপাতালগুলির অগ্নি নির্বাপক ব্যবস্থার দুরবস্থার উল্লেখ করে সরকার এক্ষেত্রে কী ব্যবস্থা নিচ্ছে তা স্বাস্থ্যমন্ত্রীর কাছে জানতে চান।

'মুসলিম নারীদের গণতান্ত্রিক অধিকার চাই'

'তিন সন্তান নিয়ে খুব কষ্ট করে মামার বাড়িতে থাকি। আমার স্বামী আর একটি বিয়ে করে আমাকে তালাক দিয়েছে।' ১১ ডিসেম্বর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বারভাঙা হলে এক সেমিনারে কথাগুলি বলতে বলতে কান্নায় ভেঙে পড়লেন মুর্শিদাবাদ থেকে আসা ২৮ বছরের টগরা খাতুন। সেমিনারের আয়োজন করেছিল 'ফোরাম ফর এমপাওয়ারমেন্ট অফ উইমেন ইন ইন্ডিয়া'। 'ভারতীয় মুসলিম নারীর অধিকার ঃ আজকের প্রেক্ষিতে' শীর্ষক সেমিনারে টগরা খাতুনের মতো তালাকপ্রাপ্তা নাজিরা বিবি, সারভানু খাতুন, সাবিনা খাতুন, রাহিমা বিবির মতো অনেকেই চোখের জলে তাঁদের অসহায় জীবনের কথা তুলে ধরেন। মর্যাদাময় জীবনের সন্ধানেই তাঁরা ফোরামের আহ্বানে সাড়া দিয়ে কলকাতায় এসেছিলেন।

সেমিনারের প্রথম পর্বে আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন ফোরামের রাজ্য সম্পাদিকা অধ্যাপিকা ডঃ আফরোজা খাতুন। তিনি বলেন, 'দরিদ্র অশিক্ষিত মুসলিম পরিবারে কথায় কথায় মেয়েদের তালাক দিয়ে দেওয়া হয়। মুসলিম অধ্যুষিত মুর্শিদাবাদ জেলায় এই সংখ্যাটা লক্ষাধিক। সরকারি হস্তক্ষেপে কোর্টের মাধ্যমেই তালাক দেওয়ার নিয়ম। বিশ্বের বহু ইসলামিক দেশ নারীদের নিরাপত্তার জন্য আইন পরিবর্তন করেছে। ভারতবর্ষেও আইন পরিবর্তন হওয়া প্রয়োজন।' ফোরামের রাজ্য সভাপতি ও সেমিনারের সভাপতি প্রাক্তন বিচারপতি মলয় সেনগুপ্ত বলেন, 'পৃথিবীর বিভিন্ন ইসলামিক দেশ মরক্কো, তুরস্ক, মালদ্বীপ, বাংলাদেশ, তিউনিশিয়া, ইন্দোনেশিয়া ইত্যাদি জায়গায় আইন করে বহুবিবাহ বন্ধ করা হয়েছে। ভারতবর্ষেও বন্ধ করা দরকার। তিনি বলেন, সম্পত্তিতে সমান অধিকার নেই মুসলিম মেয়েদের। আইন প্রসঙ্গে বিশিষ্ট সমাজসেবী স্বপন ঘোষাল বলেন, 'ভারতে নবজাগরণ ও স্বাধীনতা আন্দোলনে সামাজিক, সাংস্কৃতিক গণতন্ত্রীকরণ হয়নি। ধর্মনিরপেক্ষতার নামে ভারত একটি বহুধর্মীয় রাষ্ট্রে পরিণত হয়েছে। আইনে, শাসনে, বিচারবিভাগেও তার প্রভাব হয়েছে। বাবরি মসজিদ নিয়ে এলাহাবাদ হাইকোর্টের রায় তার প্রমাণ। অধ্যাপক সুধীন চট্টোপাধ্যায় এই ধরনের সমাজসংস্কারমূলক আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য উদ্যোক্তাদের অভিনন্দন জানান। এছাড়া বক্তব্য রাখেন সিটি কলেজের টিচার্স ইনচার্জ অধ্যাপিকা শাশ্বতী ঘোষ, প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যাপিকা উত্তরা চক্রবর্তী, মাদ্রাসার অধ্যক্ষ মণিরুজ্জামান, অধ্যাপক পুলক নারায়ণ ধর, ডঃ বিশ্বনাথ গঙ্গোপাধ্যায় প্রমুখ।

সেমিনারের দ্বিতীয় পর্বে প্রশ্ন-উত্তর ভিত্তিক আলোচনা করেন বিশিষ্ট সমাজসেবী কেশোয়ার জাহান, অধ্যাপক ডঃ আলাউদ্দিন, অধ্যাপক ডঃ সোহরাব হোসেন, আইনজীবী সাজিদা কাদের, সমাজসেবী জাহেদ আক্তার। অমর্যাদাকর হিন্না বিয়ে বন্ধ ও দত্তক আইন মুসলিমদের মধ্যে চালু করার বিষয়ে সকলেই সহমত প্রকাশ করেন এবং ধর্মের নামে নারী নির্যাতনের বিরুদ্ধে সোচ্চার হন। এছাড়া রাজ্য জুড়ে নারী-পুরুষ হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে বৃহত্তর সামাজিক সংস্কারমূলক গণতান্ত্রিক আন্দোলন গড়ে তোলার অঙ্গীকার করেন। দ্বিতীয় পর্বে প্যানেল ডিসকাসন পরিচালনা করেন ফোরামের অন্যতম রাজ্যনেত্রী খাদিজা বানু। ফোরামের যাণ্মাসিক পত্রিকার উদ্বোধন করেন বিচারপতি মলয় সেনগুপ্ত।

স্বাগত জানাল কেন্দ্রীয় কমিটি

একের পাতার পর

দুর্গতিকে আরও বহুগুণ বৃদ্ধি করছে। এর বিরুদ্ধে মাঝে মাঝেই মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে আন্দোলনে ফেটে পড়ছে। ভবিষ্যৎ আন্দোলনের দাবিপত্রে জনগণের এই জ্বলন্ত ইস্যুগুলিকেও যুক্ত করা দরকার।

গত ১১ জানুয়ারি, দিল্লির 'যন্তরমন্তরে' শ্রী আন্না হাজারের একদিনের অনশনস্থলে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দের অংশগ্রহণের মাধ্যমে অনুষ্ঠিত 'মহা বিতর্কে' আমাদের দলকে আমন্ত্রণ না জানানোয় আমরা আলাদা করে আমাদের বক্তব্য মানুষের কাছে তুলে ধরছি।

রাজ্য কমিটির দাবি

একের পাতার পর

সর্বদলীয় সভা আহ্বান করেছেন, আমরা তাকে স্বাগত জানাচ্ছি। আমরা আশা করব, তিনি কঠোর হাতে দোষীদের শাস্তির ব্যবস্থা করবেন এবং রাজ্যের সর্বত্র যাতে চোলাই মদের কারবার বন্ধ হয়, তা নিশ্চিত করবেন।

শুধু চোলাই মদ নয়, গত ৩৪ বছরে সরকারি আয় বাড়াবার ছলে যে ভাবে সব রকমের মদের দোকান খোলার লাইসেন্স বিলানো হয়েছে, তা এক উদ্বেগজনক পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছে। যুবকরা তো বটেই, স্কুলছাত্ররাও এর শিকার হচ্ছে। গরিব মানুষের আয়ের একটা বড় অংশ চলে যাচ্ছে এর পিছনে। পারিবারিক নির্যাতন বাড়ছে। ব্রিটিশ সরকার শোষণের স্বার্থে যেদিন এ দেশে মাদক ব্যবসার প্রসার ঘটিয়েছিল, স্বাধীনতা আন্দোলনের নেতৃবৃন্দ তার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছিলেন। তাঁদের আহ্বানে দেশপ্রেমিক যুবকরা প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিলেন। স্বাধীন ভারতে ঠিক বিপরীত ঘটনা ঘটতে দেখা যাচ্ছে। আমাদের দল এর বিরুদ্ধে শুধু লাগাতার প্রচার করে আসছে তাই নয়, দলের মহিলা ও যুব সংগঠন বিশেষ করে মাদক ব্যবসার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে তুলেছে। চোলাই মদের দোকানকেও লাইসেন্স দেওয়ার প্রস্তাবকে আমরা অত্যন্ত বিপজ্জনক ও ঘৃণ্য বলে মনে করি। তাহলে তো চুরি-ডাকাতিকেও লাইসেন্স দিতে হয়!

মুখ্যমন্ত্রী নিহতদের পরিবার প্রতি ২ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ দেওয়ার যে ঘোষণা করেছেন, আমরা মনে করি, একমাত্র উপার্জনক্ষম ব্যক্তিকে হারানো সর্বস্বান্ত এই পরিবারগুলির পক্ষে তা অত্যন্ত কম। ক্ষতিপূরণের পরিমাণ কমপক্ষে ৪ লক্ষ টাকা করা উচিত। আমরা চাই, সরকার মদ ব্যবসায়ীদের মদতদাতা আবগারি দপ্তর, পুলিশ-প্রশাসন ও রাজনৈতিক কর্তাব্যক্তিদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নিক। আমরা দেশের ছাত্র-যুবসমাজ এবং সাংবাদিক বন্ধুদেরও আবেদন করছি, মদের প্রসারের বিরুদ্ধে তাঁরা প্রচার ও প্রতিরোধ গড়ে তুলুন।

উত্তরপত্রের পুনর্মূল্যায়নের দাবিতে বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ে ডেপুটেশন

বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতক স্তরের অধিকাংশ ছাত্রছাত্রীর রেজাল্ট গত কয়েক বছর ধরে আশানুরূপ না হওয়ায় ছাত্রছাত্রীরা আশঙ্কা করছে যে, উত্তরপত্র ঠিকমতো দেখা হচ্ছে না। কিন্তু এর প্রতিকার হচ্ছে না। ছাত্রদের অসহায়তা অনুভব করেই ছাত্র সংগঠন অল ইন্ডিয়া ডি এস ও বর্ধমান জেলা কমিটি ৭ ডিসেম্বর বিশ্ববিদ্যালয়ের সহ উপাচার্যের কাছে ডেপুটেশন দেয়। স্নাতক স্তরে পার্ট ওয়ান পরীক্ষার উত্তরপত্রের পুনর্মূল্যায়ন, অবিলম্বে উত্তরপত্রের স্পট রিভিউ প্রভৃতি দাবিতেই ছিল এই ডেপুটেশন।

বিপন্ন শিক্ষার সর্বজনীনতা

শিশু পড়ে যাওয়ার আশঙ্কা সত্ত্বেও উঠে দাঁড়াতে চায়। তাগিদটা তার ভিতর থেকে আসে। এক পা দু'পা করে কয়েক পা হেঁটে যখন দেখে আর পারছে না তখন সে কোনও অবলম্বন জড়িয়ে ধরে, অথবা পড়ে যায়। এমনি করে সে বহু ওঠাপড়ার পরীক্ষা দিয়ে একদিন হাঁটতে শেখে।

যাঁরা মনে করেন পরীক্ষার কথা শুনলে শিশুরা ভয় পায়, তাঁদের ধারণা শিশু মনস্তত্ত্বসম্মত নয়। শিশুরা যখন প্রথম বিদ্যালয়ে প্রবেশ করে তখন তাদের দরকার স্বচ্ছন্দ মন। বিদ্যালয়ে শিক্ষক-শিক্ষিকারা যদি তাদের এই স্বচ্ছন্দ মন দিতে পারেন, তা হলে পরীক্ষার কথা শুনলে তাদের ভয় পাওয়ার কোনও কারণ নেই।

এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের একটি অমূল্য উক্তি স্মরণীয়। তিনি লিখেছেন, পরীক্ষার হাত থেকে নিষ্কৃতি পাবার সবচেয়ে বড় রাস্তা হচ্ছে পরীক্ষায় পাশ করা। (শিক্ষার মিলন - কালান্তর)

শিক্ষায় পাশফেল প্রথা থাকলে — প্রথমত, শিক্ষক পরিষ্কার বুঝে নেন যে, চতুর্থ শ্রেণির শেষ পরীক্ষায় ছাত্রছাত্রীদের ভাল ফল করাতে হলে একদম প্রথম শ্রেণি থেকে তাদের শক্তপোক্ত করে গড়ে তুলতে হবে। কারণ, চতুর্থ শ্রেণির শেষ পরীক্ষার উত্তরপত্রগুলি অজানা স্কুলের অজানা শিক্ষকদের হাতে পড়বে। দ্বিতীয়ত, ছাত্রছাত্রীরা 'ফেল' করার ভয়ে নয়, ফেল করার অমর্যাদা থেকে আত্মরক্ষা করতে পড়াশোনায় অধিকতর মনোযোগী হয়। তৃতীয়ত, অভিভাবকরা চুপ করে থাকেন না। যাতে বছরটা নষ্ট না হয় সে জন্য তাঁরা ছেলেমেয়েদের অহরহ সতর্ক করে যান।

পাশফেল-প্রথাহীন শিক্ষায়, যখন ছাত্রছাত্রীরা জেনে যায় যে, বছর শেষ হলে তারা সবাই পাশ করবে, তখন প্রতিযোগিতার মূল অভিমুখটাকে ভোঁতা করে দেওয়া হয়। পড়াশোনার আগ্রহে ভাটা পড়ে। মেধা অলস হয়ে পড়ে। ধীরে ধীরে তার অবনমন ঘটে। ছেলেমেয়েরা অভিভাবকদের মুখের ওপর বলে দেয়, চেষ্টা করে কী হবে? সবাই তো পাশ করবে। শিক্ষকরাও এই পরিবেশের হাতে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হন। পাশফেল প্রথাহীন শিক্ষায় এইটেই সব চেয়ে বড় নেতিবাচক দিক।

প্রসঙ্গ পাশফেল

জনমত কী বলছে

এই সব ছাত্রছাত্রীদের একটা বড় অংশ — বিশেষ করে যারা শেষের 'গ্রেড'গুলির মধ্যে থাকবে শিক্ষা ক্ষেত্র থেকে তারা অষ্টম শ্রেণির শংসাপত্র নিয়ে বিদায় নেবে। আসলে ড্রপআউট-এর মড়কটা শংসাপত্রের মোড়কে গ্রহণযোগ্য করা হবে। এই তীব্র বেকার সমস্যার দিনে যেখানে তাবড় ডিগ্রিধারীরা ঘোল খাচ্ছেন, সেখানে ঐ হতভাগ্য শংসাপত্রধারীদের স্থান কোথায় হবে তা একমাত্র ভবিষ্যৎই বলতে পারে।

দ্বিতীয় পর্যায়ে, নবম ও দশম শ্রেণিতে পাশফেলহীন মূল্যায়ন পদ্ধতি থাকছে না। ছাত্রছাত্রীদের পাশফেল প্রথার পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হচ্ছে। যেহেতু তারা শুরু থেকেই ওই ধরনের পরীক্ষায় অনভ্যস্ত, নবম শ্রেণির একটা বড় অংশ ফেল করে শিক্ষা থেকে হটে যাবে। দশম শ্রেণিতে যারা উত্তীর্ণ হবে তাদেরও একটা বড় অংশ 'টেস্ট' পরীক্ষায় হটবে। শেষ মেশ যারা মাধ্যমিক পরীক্ষা দেবে তাদের সবাই যদি পাশ করেও যায় তাদের পরীক্ষার ফল এমন আহামরি হবে না যা পরবর্তী উচ্চ শিক্ষার পরীক্ষায় বা পেশাগত প্রতিযোগিতায় ধোপে টিকবে।

অবস্থা দেখে, যাঁরা অবস্থাপন্ন তাঁরা তাদের ছেলেমেয়েদের নিয়ে বেসরকারি স্কুলের দিকে হাঁটবেন। চাহিদা বাড়লে স্থানে স্থানে বেসরকারি স্কুল গড়ে উঠবে। এমনকী এমন একদিন আসতে পারে ছাত্র শূন্যতার জন্য সরকারি মাধ্যমিক স্কুলগুলো শিক্ষা ব্যবসায়ীরা সস্তায় কিনে নেবে যেমন প্রাথমিকে পাশ-ফেল প্রথা উঠে যাওয়ায় রাজ্যে বহু প্রাথমিক বিদ্যালয় উঠে গিয়েছে।

ফল কী দাঁড়াবে? সারা দেশে রাজ্যে রাজ্যে কোটি কোটি গরিব ও নিম্নবিত্ত ঘরের ছেলেমেয়েরা শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হবে। তারা যে তিমিরে ছিল সেই তিমিরেই রয়ে যাবে।

নলিনী প্রামাণিক
অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক, ঘোড়াদল, দক্ষিণ ২৪ পরগণা

গরিব ছাত্ররা আগেই হেরে বসে থাকবে

বর্তমান রাজ্য সরকার, অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত পাশ-ফেল প্রথা উঠিয়ে দিয়ে সাধারণ মানুষের শিক্ষা লাভ করার গুরুত্বকেই লঘু করে দিতে চাইছে। এই রাষ্ট্র কাঠামোয় সবকিছুকেই পণ্য করে তোলা হয়েছে। শিক্ষাও তার ব্যতিক্রম নয়। কিন্তু অন্য সব উৎপাদনের গুণমান পরিমাপক ব্যবস্থা থাকবে অথচ শিক্ষা ব্যবস্থায় তা থাকবে না, এটা যথার্থ নয়। পরিকল্পিতভাবেই সমাজের সম্পদশালী অংশকে প্রতিযোগিতার বাইরে রেখে দেওয়ার কৌশল হিসাবেই এটা করা হচ্ছে। এই সমাজে শিক্ষালাভের একটাই উদ্দেশ্য থাকে। কোনওক্রমে একটা পেশায় উত্তরণ। জ্ঞানলাভের আনন্দ এখানে নেই। পরীক্ষার চাপেই কিছু পড়াশোনা এগোয়। ফলে গরিব ঘরের ছেলেমেয়ের সরকারি সাহায্য প্রাপ্ত স্কুলের পরীক্ষাহীন শিক্ষা তাকে এমনই অনুপযুক্ত করে তুলবে যে, চাকরির পরীক্ষায়, প্রবেশিকা পরীক্ষায় বেসরকারি স্কুলের প্রতি সপ্তাহে পরীক্ষা দেওয়া ধনী ঘরের ছাত্রছাত্রীর কাছে আগেই হেরে বসে থাকবে। আস্তিনের নিচে এই অস্ত্র রেখেই কি সর্বশিক্ষা অভিযান চালানো হচ্ছে? মন্ত্রীমশাই কী বলেন? চাকরির পরীক্ষা, প্রবেশিকা পরীক্ষা কি উঠে যাচ্ছে? আর নির্বাচনে পাশ-ফেল সেটা...!

উল্লাসকর বন্দ্যোপাধ্যায়,
দেশবন্ধু নগর, কলকাতা ৫৯

শিক্ষা প্রহসনে পরিণত হবে

পাশ-ফেল তুলে দিলে শিক্ষা প্রহসনে পরিণত হবে। আমাদের দেশে সাধারণ পরিবারগুলির ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষার জন্য পাশ-ফেল প্রথা খুবই প্রয়োজন। অভিভাবকরা এর ভিত্তিতেই সচেতন থাকেন। ছাত্রছাত্রীদের ঠিকভাবে শেখাতে গেলে কিছু নিয়মকানুন এবং পদ্ধতি অনুসরণ করা প্রয়োজন। তাদের সত্যের সামনে দাঁড় করাতে হয়। যে যেমন ইচ্ছা তেমন পড়বে, না পড়লেও পরের ক্লাসে চলে যাবে — এ রকম চললে শিক্ষা হতে পারে না। তাহলে বাড়ি বাড়ি মিড ডে মিল পাঠিয়ে দিলেই তো বাড়িতে বসে শেখা যেত। তা হয় না। যথাযথ শিক্ষা দিতে গেলে পরীক্ষা এবং তার সাথে পাশ-ফেল প্রথা থাকা একান্তই দরকার।

দীপ্তি সরকার
ভাষাতত্ত্ব বিভাগ, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

কমরেড প্রেসিডেন্ট কিম জং ইল-এর মৃত্যুতে আই এ সি সি-র শোক

ইন্টারন্যাশনাল অ্যান্টিইম্পিরিয়ালিস্ট কোঅর্ডিনেটিং কমিটির সাধারণ সম্পাদক কমরেড মানিক মুখার্জী ১৯ ডিসেম্বর ওয়ার্কার্স পার্টি অব কোরিয়া ও উত্তর কোরিয়ার জনগণের প্রতি এক শোকবার্তায় বলেছেন,

"আন্তর্জাতিক কমিটি ও আমার নিজের পক্ষ থেকে আমি ওয়ার্কার্স পার্টি অব কোরিয়ার সাধারণ সম্পাদক, ন্যাশনাল ডিফেন্স কমিশনের চেয়ারম্যান এবং কোরিয়ান পিপলস আর্মির সর্বোচ্চ অধিনায়ক কমরেড প্রেসিডেন্ট কিম জং ইল-এর দুঃখজনক ও আকস্মিক জীবনাবসানে শোক প্রকাশ করছি। এ শুধু উত্তর কোরিয়ার জনগণেরই নয়, সামগ্রিক ভাবে আন্তর্জাতিক সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনেরই এক ক্ষতি। সমাজতান্ত্রিক শিবিরের বিপর্যয়ের পর সাম্যবাদ ও সমাজতন্ত্রের আদর্শকে ঊর্ধ্বে ধরে রাখার জন্য এবং সমাজতান্ত্রিক উত্তর কোরিয়াকে মার্কিন নেতৃত্বে সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসন থেকে রক্ষা করার জন্য কমরেড কিম জং ইল দৃঢ়তার সাথে লড়াই করেছেন। আমরা নিশ্চিত যে, এই গভীর শোকের সময়েও ওয়ার্কার্স পার্টি অব কোরিয়া কমরেড কিম জং ইল-এর ঐতিহ্য রক্ষায় সুদৃঢ় থাকবে এবং সাম্রাজ্যবাদী শিবিরের আক্রমণ থেকে সমাজতন্ত্রকে রক্ষা করবে। বিশ্বের সকল জনগণের সাথে ভারতের মেহনতি জনগণও উত্তর কোরিয়ায় সমাজতন্ত্র রক্ষার জন্য কোরীয় জনগণের মহৎ সংগ্রামের পাশে আছে"।

উত্তরপত্রের প্রতিলিপি দেখতে ৫০০ টাকা

প্রতিবাদ জানাল এ আই ডি এস ও

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ঘোষণা করেছে, ৫০০ টাকা দিলে বিএ, বিএসসি পার্ট ওয়ান পরীক্ষার উত্তরপত্রের প্রতিলিপি দেখতে দেওয়া হবে।

এ বছর পার্ট ওয়ান পরীক্ষায় বহু ছাত্রছাত্রীর ফল আশানুরূপ হয়নি। তাদের বক্তব্য পরীক্ষাপত্রের সঠিক মূল্যায়ন হয়নি। এ আই ডি এস ও বরাবরের দাবি উত্তরপত্রের জেরক্স দিতে হবে। ৫০০ টাকা দেওয়ার এই ফরমান ছাত্রদের মধ্যে প্রবল ক্ষোভ তৈরি করেছে।

১৩ ডিসেম্বর অল ইন্ডিয়া ডি এস ও-র কলকাতা জেলা কমিটির পক্ষ থেকে সহসভাপতি কমরেড বন্দিতা পাত্রের নেতৃত্বে চার সদস্যের এক প্রতিনিধি দল সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ জানিয়ে উপাচার্য ও সহউপাচার্য (শিক্ষা) কে স্মারকলিপি দেয়। তাঁদের কাছে প্রতিনিধি দল জানতে চায় সুপ্রিম কোর্ট ২০০৮ সালের একটি কেসে রায় দেয় — আর টি আই অনুযায়ী ইচ্ছুক ছাত্রদের উত্তরপত্রের প্রতিলিপি দিতে কর্তৃপক্ষ বাধ্য। সেখানে কোনও ফি নির্ধারিত ছিল না। তাহলে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ সুপ্রিম কোর্টের রায় লঙ্ঘন করে কেন টাকা নেবে? এ বিষয়ে কর্তৃপক্ষ কোনও সদুত্তর দিতে পারেন নি। তাঁরা বলেছেন, এই প্রক্রিয়া শুরু করতে যে অর্থের প্রয়োজন তার দায় রাজ্য সরকার বহন না করায় এই টাকা নিতে হচ্ছে। ডি এস ও জানিয়েছে দাবি না মানা হলে তারা আন্দোলন গড়ে তুলবে।

পাশ-ফেল তুলে দেওয়ার বিরুদ্ধে নদীয়ায় ছাত্রদের প্রতিবাদ

পাশ-ফেল তুলে দেওয়ার সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে ১২ নভেম্বর এ আই ডি এস ও-র বান্দাখোলা আঞ্চলিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে মূল বক্তা ছিলেন সংগঠনের নদীয়া জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড বিমান কর্মকার। এছাড়া বক্তব্য রাখেন এ আই ডি এস ও-র জেলা সহসভাপতি কমরেড মসিকুর রহমান এবং এস ইউ সি আই (সি)-এর সংগঠক কমরেড মামলত সেখ। সম্মেলন থেকে কামাল হোসেনকে সভাপতি, দিগার সেখকে সহসভাপতি ও আকিমুদ্দিন সেখকে সম্পাদক করে ১৯ জনের কমিটি গঠিত হয়।

শিক্ষা কনভেনশন বানচাল করার ষড়যন্ত্র বাওয়ালিতে

অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত পাশ-ফেল প্রথা তুলে দেওয়ার প্রতিবাদে ১০ ডিসেম্বর দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার বাওয়ালিতে স্থানীয় সেভ এডুকেশন (প্রস্তুতি) কমিটি সারদা রামকৃষ্ণ বালিকা বিদ্যাপীঠে এক শিক্ষা কনভেনশনের আয়োজন করেছিল। এ বিষয়ে প্রধান শিক্ষিকার অনুমোদনও নেওয়া হয়েছিল। কিন্তু কোনও অজ্ঞাত কারণে বিদ্যাপীঠের সম্পাদক ও জেলা পরিষদের স্বাস্থ্য দপ্তরের কর্মাধ্যক্ষ এবং সাউথ বাওয়ালি গ্রাম সভার প্রধান এই কনভেনশন বানচাল করার ষড়যন্ত্র করে।

কনভেনশনে যোগ দিতে এসে শিক্ষক-ছাত্র সহ বিশিষ্ট ব্যক্তিরা প্রধান শিক্ষিকার কাছ থেকে জানতে পারেন শিক্ষা কনভেনশনের অনুমোদন বাতিল হয়ে গেছে এবং তাঁকে বাধ্য করা হয়েছে স্কুল গেটে তালা দিতে। এই ঘটনায় উপস্থিত শিক্ষানুরাগী ব্যক্তিরা যুগপৎ বিস্মিত ও ক্ষুব্ধ হন। তাঁরা এর বিরুদ্ধে ধিক্কার জানান এবং স্কুলের সামনের মাঠেই কনভেনশন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। বর্ষীয়ান শিক্ষক নবীনচন্দ্র মণ্ডলের সভাপতিত্বে কনভেনশন শুরু হয়। মূল প্রস্তাব পাঠ করেন শিক্ষক তপন পোয়ালী। প্রধান বক্তা রাজ্য সেভ এডুকেশন কমিটির অফিস সম্পাদক ধ্যানেশ মিশ্র এবং আলিপুর বার্তার সাংবাদিক নির্মল গোস্বামী অভিজ্ঞতার নিরিখে পাশ-ফেল তুলে দেওয়ার ক্ষতিকারক দিকগুলি ব্যাখ্যা করেন। প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক প্রশান্তকুমার রায়কে সভাপতি ও তপন পোয়ালীকে সম্পাদক করে ৩৫ জনের সেভ এডুকেশন কমিটি গঠিত হয়।

সর্বদলীয় বৈঠকে

একের পাতারা পর

রাজ্য সরকার মাদকাসক্তির প্রসারে মদত দিয়ে গেছে। 'রেডি টু ড্রিঙ্ক'-এর আকারে মুদির দোকান পর্যন্ত মদ পৌঁছে দেওয়া হয়েছিল। রাজস্ব আদায়ের জন্য আরও মদের দোকান খোলা কখনওই কাম্য হতে পারে না। চোলাই মদকে লাইসেন্স দিয়ে আইনসিদ্ধ করার আমরা ঘোরতর বিরোধী। সমস্ত প্রকার মাদকদ্রব্যের বিরুদ্ধে সামাজিক আন্দোলন গড়ে তোলা প্রয়োজন। সরকারকে সেই আন্দোলনের পৃষ্ঠপোষকতা করতে হবে। আমরা গান্ধিজির নেতৃত্বে মাদকবিরোধী আন্দোলননের কথা স্মরণ করতে পারি। এ ক্ষেত্রে পুলিশ, আবগারি দপ্তর, গুণ্ডা, স্থানীয় প্রভাবশালী রাজনৈতিক দল প্রভৃতির যোগসাজশ খুবই শক্তিশালী। এদের মদতে মাদকবিরোধী আন্দোলনকারীদের উপর আক্রমণ চালানো হয়। আমাদের দুঃখজনক অভিজ্ঞতা হল, ২০০৬ সালে পুরুলিয়া শহরে মদ ভাঁটির বিরুদ্ধে আন্দোলনরত আমাদের মহিলা কর্মীদের বিরুদ্ধে জামিন অযোগ্য ধারায় মামলা দেওয়া হয়েছিল। সরকারের দৃষ্টিভঙ্গির উপর অনেক কিছু নির্ভর করে। মাদকদ্রব্য বিরোধী দিবসে স্কুলের বাচ্চাদের নিয়ে কেবল মিছিল করলে হবে না। যথার্থ জনমত গড়ে তুলতে পারলে কী ফল হতে পারে, তা আমরা ধূমপানের ক্ষেত্রে দেখেছি। ধূমপানের বিরুদ্ধে লাগাতার প্রচারের ফলে তা অনেক কমেছে।

এই ঘটনায় দোষী ব্যক্তিদের কঠোর শাস্তি দেওয়ার পাশাপাশি সমস্ত রাজনৈতিক দলকে প্রকাশ্যে ঘোষণা করতে হবে যে, তারা কোনও দুষ্কৃতীকে আশ্রয় দেবে না। নতুন করে মদের দোকানের লাইসেন্স দেওয়া চলবে না। সরকারের পৃষ্ঠপোষকতায় সমস্ত ধরনের মাদকদ্রব্যের বিরুদ্ধে জনমত গড়ে তুলতে হবে।

বর্তমান সরকার হয়ত প্রথম ৬ মাসে কিছু করতে পারেনি। সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে চললে আগামী দিনে এই কাজে তারা সফল হবে, আমাদের এই প্রত্যাশা।

বেহালায় ডি ওয়াই ও-র রক্তদান শিবির

'উপহারের প্রলোভনে নয়, সামাজিক দায়বদ্ধতা থেকে রক্তদান করুন' — এই আহ্বান জানিয়ে এ আই ডি ওয়াই ও বেহালা পশ্চিম আঞ্চলিক কমিটি ১১ ডিসেম্বর বি জি প্রেস করুণাময়ী আশ্রম মাঠে এক রক্তদান শিবিরের আয়োজন করে। ৬১ জন যুবক-যুবতী রক্তদান করেন। শিবিরের উদ্বোধন করেন এলাকার বিশিষ্ট চিকিৎসক ডাঃ ডি সি সান্যাল। উপস্থিত ছিলেন ডাঃ নিত্যানন্দ বিশ্বাস, সংগঠনের রাজ্য সম্পাদক কমরেড নিরঞ্জন নস্কর এবং এস ইউ সি আই (সি) বেহালা পশ্চিম আঞ্চলিক কমিটির সম্পাদক কমরেড ইন্দ্রজিৎ মণ্ডল। প্রত্যেক রক্তদাতাকে ফুলের স্তবক ও ক্ষুদিরামের ছবি সংবলিত স্মারক দিয়ে সংবর্ধিত করা হয়। রক্তদাতাদের অভিনন্দন জানান সংগঠনের আঞ্চলিক সম্পাদক কমরেড বাসুদেব প্রামাণিক।

ঘরে ঘরে কান্নার রোল

একের পাতার পর

আসা যে কারওরই এই পরিবেশে বেশিক্ষণ থাকা কঠিন। অস্বস্তি ঘিরে ধরে চারদিক থেকে।

দুপুরে মগরাহাট থানায় যখন যুব সংগঠন ডি ওয়াই ও, মহিলা সংগঠন এম এস এস এবং ছাত্র সংগঠন ডি এস ও-র নেতৃত্বে বিক্ষোভ ও ডেপুটেশন চলছিল, তখন জনতার ভিড়ে এসে দাঁড়িয়েছিলেন সুভদ্রা হালদার। গালে শুকিয়ে যাওয়া চোখের জলের দাগ। থানার পাশেই বাড়ি। বললেন, ঘণ্টাখানেক আগে তাঁর পরিবারের বাসুদেব মণ্ডল মারা গেলেন। পরিবারের আর এক সদস্য বিশ্বনাথ মণ্ডলকে আজই ব্লক হাসপাতাল থেকে ডায়মন্ডহারবার মহকুমা হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। কানে এল মাছের ব্যবসায়ী দুলাল মালিকের দীর্ঘশ্বাস ভরা মন্তব্য, কাল পর্যন্ত যে লোকটা থানা থেকে মর্গে বডি বয়ে নিয়ে গেছে, আজ সে নিজেই মর্গে ঢুকে গেল। একটু পরেই থানার সামনের পিচরাস্তা দিয়ে বিষমদে আর এক আক্রান্তকে নিয়ে ভ্যান ছুটেছে হাসপাতালের উদ্দেশে। এই প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত বিষমদে মৃতের সংখ্যা ১৭৩ ছাড়িয়ে গেছে। নিঃসন্দেহে আরও বাড়বে এই সংখ্যা। অসুস্থের সংখ্যা বহু।

বিষমদে আক্রান্ত এরা সবাই গরিব, নিম্নবিত্ত শ্রেণির। অনেকেই পরিবারের একমাত্র উপার্জনশীল ব্যক্তি। হকারি, দিনমজুরি করে, রাজমিস্ত্রির জোগাড়ের কাজ করে, রিক্সা টেনে সারাদিন নিংড়ে দেয় শরীরটাকে। অভাবের সংসার। স্ত্রী-সন্তানদের দু-বেলার খাবার, চিকিৎসার ওষুধ, পরনের পোশাক জোটে না। দারিদ্রের কষাঘাতে জীর্ণ-দীর্ণ পরিবারে অহরহ অশান্তি, কান্না, চিৎকার। রেহাই পেতে চায় নেশায় ডুবে। রাতে বাড়ি ফেরার পথে ট্রেন থেকে নামলেই, কিংবা স্টেশন-হাট-মোড়ে এলেই চোলাইয়ের ঠেক তাদের যেন হাতছানি দিয়ে ডাকে। শরীরের চরম ক্লান্তি ও অক্ষমতার জ্বালা ঝেড়ে ফেলতে তাদের কাছে একমাত্র 'বিনোদন' হয়ে দাঁড়ায় পলিথিন পাউচে ভরা দশ-বিশ টাকার চোলাই। চোলাই গিলে, সঙ্গে আরও খানিকটা নিয়ে বাড়ি ফেরে। স্ত্রীকে মারধর করে। বাচ্চারা কাঁদতেও সাহস করে না। 'নেই', 'এনে দাও' শব্দগুলো আর কানের কাছে 'ঘ্যান ঘ্যান' করে না। আবার পরদিন ক্ষিদের কান্না শোনার আগেই ভোর ভোর কাজের খোঁজে বেরিয়ে পড়া। এই-ই এদের জীবনচক্র। এই অসহায় মানুষগুলির চোলাই খাওয়া, আর দামি মদ কিনে এনে বাড়িতে বা পার্টিতে খাওয়ার উচ্চবিত্ত ফ্যাশন — দুটো এক জিনিস নয়। প্রশাসন ওদের জন্য বিপিএল কার্ডের ব্যবস্থা রাখেনি। রোগে চিকিৎসার ব্যবস্থা রাখেনি। এমনকী, বিষমদে আক্রান্ত হয়ে যখন হাসপাতালে, তখনও এদের দরিদ্র পরিবারগুলিকেই ধার-দেনা করে অধিকাংশ ওষুধ কিনে দিতে হয়েছে, ওই ওষুধগুলো পাওয়ার ব্যবস্থাও প্রশাসন তাদের জন্য করেনি। কিন্তু, চতুর্দিকে ব্যবস্থা রেখেছে চোলাই মদের। খাও, মাতাল হও, সারা দিনের আয়ের যে সম্বলটুকু স্ত্রী-সন্তানদের মুখে আহার জোগাতে — সেটা মদের দোকানে ঢালো, আর সবশেষে বিষমদে মরণের কোলে ঢলে পড়ো।

তা যদি না হবে, তাহলে মগরাহাট স্টেশন সংলগ্ন ঠেকগুলো থেকে থানা যেখানে হাঁটা পথে মিনিট সাতেকের রাস্তা, উস্তির সংগ্রামপুর হাটের ঠেকগুলো যেখানে পুলিশ ক্যাম্প থেকে ১০ মিটারের মধ্যে, সেখানে কেন বছরের পর বছর ধরে রমরমিয়ে চলে বেআইনি চোলাই মদের ঠেক? নানা এলাকায় ভুক্তভোগী গৃহবধূ ও সাধারণ মানুষ মিলে বার বার ঠেক ভেঙে দেওয়া সত্ত্বেও কারবারিদের দৌরাত্ম্য বন্ধে পুলিশ কেন কড়া ব্যবস্থা নেয় না? এ প্রশ্ন স্বাভাবিকভাবেই উঠছে।

প্রাইভেট টিউশন পড়ানো শিক্ষক ইউনিস আলি লস্করের অভিযোগ, গত ক' মাসে দেখছি, একেবারে সবজির দোকানের মতো সামনে ঢেলে বিক্রি হচ্ছে দশ-কুড়ি টাকার প্যাকেট। পুলিশ, জিআরপি রীতিমতো মাসোহারা নেয়। তাই চোখ বন্ধ করে থাকে। এ সব উঠিয়ে দিলে হয়তো মদের নেশাটা যেত।

গরিব মানুষকে মদের নেশা থেকে বাঁচাতে চোলাইয়ের ভাঁটি ও ঠেকগুলো উঠিয়ে দেওয়ার প্রয়োজনীয়তা ইউনিস আলিরা বুঝলেও, বুঝতে চায় না সরকার ও তাদের পুলিশ প্রশাসন। তারা এগুলো পুষে রাখতে চায়। না হলে, চোলাই বন্ধ করা কি এতই কঠিন? আমাদের সরকার ও প্রশাসন কি এতই দুর্বল ও অক্ষম যে, তাদের ক্ষমতায় কুলোচ্ছে না? বাস্তব তা নয়। রাজ্য সরকার দেশি মদের ব্যবসা করে ট্যাক্স তুলছে। আরও ট্যাক্স তুলতে বেশি সংখ্যায় মদের দোকান খোলার লাইসেন্স দিচ্ছে, আরও মদের কারখানা খোলার অনুমতি দিয়েছে। অন্যদিকে, পুলিশ চোলাই মদের ভাঁটি ও ঠেক চালানোর অলিখিত অনুমতি দিয়ে মাসোহারা কামাচ্ছে।

নানা এলাকায় বেশ কয়েকবার ঠেক ভেঙে উঠিয়ে দেওয়া হলেও ফের সে সব ফিরে এসেছে পুলিশ-প্রশাসনের নির্লজ্জ মদতে। সে কারণেই মানুষের বুকে বেদনা ও শোকের পাশাপাশি জমে আছে তীব্র ক্ষোভের বারুদ। মাঝে মধ্যেই তার বিক্ষিপ্ত বিস্ফোরণ ঘটছে। ১৫ ডিসেম্বর যখন লাশের পর লাশ আসছে, স্থির থাকতে পারলেন না যুবক ফকিরউদ্দিন। রাস্তা থেকে থান ইট তুলে নিয়ে ছুঁড়ে মারলেন ঝাঁপ বন্ধ একটা মদের ঠেকের দরজায়। তারপর ক্যাম্পের পুলিশ অফিসারদের উদ্দেশে খানিক গালগালি ছুঁড়ে দিয়ে চুপ করে গেলেন। বিক্ষুব্ধ মানুষ মদের ঠেক, সংলগ্ন ভিডিও হল ভেঙে গুঁড়িয়ে দিচ্ছে। শুধু বেআইনি মদের ঠেক নয়, সরকারি লাইসেন্সপ্রাপ্ত দেশি মদের দোকানকেও মানুষ তাদের জীবনের শত্রু বলে বুঝতে শুরু করেছে। একশ্রেণির সংবাদমাধ্যম লাইসেন্সের নামে মদের রমরমাকে অটুট রাখার পক্ষে উমেদারি করলেও সংগঠিত জনতা সেগুলোকেও ভেঙে ফেলছে। তা দেখে প্রচারমাধ্যমের একটি মহল বলছে, সমাজবিরোধীরা পরিস্থিতির সুযোগ নিচ্ছে। থানায় থানায় সর্বদলীয় বৈঠক ডেকে প্রশাসন আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় সহায়তা চাইছে। কিন্তু, প্রশ্ন উঠেছে, আইনশৃঙ্খলা রক্ষার এই তাগিদ হঠাৎ এমন চাগিয়ে উঠছে কেন? মদ ব্যবসায়ীদের বাঁচাতে? কারণ, তাদেরই পৃষ্ঠপোষকতায় যখন মদের ঠেক রমরমিয়ে চালাচ্ছিল ব্যবসায়ীরা, গরিব মানুষগুলিকে যখন চোলাইয়ের ফাঁদে ফেলে সর্বস্বান্ত করা হচ্ছিল, কুখ্যাত সেলিমের আশ্রয়পুষ্ট খোঁড়া নূর, কিংবা রবিয়ল তা থেকে কোটি কোটি টাকা মুনাফা লুঠছিল, তখন কোথায় ছিল আইনশৃঙ্খলা রক্ষার এই তাগিদ? এতগুলি মানুষকে মৃত্যুর গহ্বরে ঠেলে দেওয়ার ক্ষেত্রে পুলিশ প্রশাসনের ভূমিকা ওই মারণ-মদের কারবারিদের থেকে কি কোনও অংশে কম?

সংবাদমাধ্যম প্রচার করছে, লাইসেন্স প্রাপ্ত দেশি মদের দোকান কম বলে লোকে চোলাই মদ খাচ্ছে। তাই আরও মদের দোকানের লাইসেন্স দেওয়া হোক। আসলে গরিব মানুষকে মদের নেশায় বুঁদ করে রাখাই এর উদ্দেশ্য, না হলে ওরা মাথা তুলতে চাইবে।

সরকারি ক্ষমতায় দল বদলে গেলে ক্রিমিনালরা ও মারণ-মদের ব্যবসায়ীরাও জামা বদলে ফেলে, নতুন সরকারি দলে নাম লেখায়, পুলিশ প্রশাসনের মদত নিয়ে নিজেদের অপকর্ম বহাল তবিয়তে চালিয়ে যাওয়ার মতলবে। সরকারি দলও তাদের সঙ্গে নিয়ে এলাকায় এলাকায় দখলদারি কায়েম করে। এই পারস্পরিক বোঝাপড়াতেই মগরাহাটের যে কুখ্যাত ক্রিমিনাল সেলিম সিপিএমের ছাতার তলায় ছিল এবং নন্দীগ্রামের গণহত্যায় অংশ নিয়েছিল, রাজ্যের ক্ষমতা বদলের পর সে এখন তৃণমূল কংগ্রেসের ছত্রছায়ায়। তার আশ্রয়পুষ্ট খোঁড়া নূর এবং অন্যান্য চোলাই কারবারিদের কাহিনীও এই। ৩৪ বছরের শাসনকালে সিপিএম নেতাদের মদতেই তো এই কারবারিদের রমরমা। এখন তারা তৃণমূল নেতাদের মদতে পুষ্ট হচ্ছে।

'বেআইনি চোলাই মদ বিক্রেতাদের উপযুক্ত শাস্তি দিতে হবে' — মগরাহাট স্টেশন সংলগ্ন এলাকায় সিপিএমের ছাত্র ও যুব সংগঠন এসএফআই এবং ডিওয়াইএফআই-এর এই পোস্টার দেখে এক যুবক যথার্থই বলছিলেন ঃ এতকাল তোমরা শাস্তি দাওনি কেন? ৩৪ বছর তো তোমাদেরই সরকার ছিল। বরং তোমাদের মদতেই তো ওরা জাঁকিয়ে বসতে পেরেছে। অন্যদিকে, মন্দিরবাজারের বাসিন্দা রোহিত হালদারের কণ্ঠে ঝরে পড়ে এক রাশ হতাশা। বললেন, 'আমরা আশায় ছিলাম, পরিবর্তনের সরকার মদ-জুয়ার বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নেবে। সাধারণ মানুষের সর্বনাশ বন্ধ হবে। তাই তো সিপিএমের বিরুদ্ধে ওদের ভোট দিয়েছিলাম। কিন্তু, এ সব কী হল? নতুন নেতারা ক্ষমতায় এসে মদ-জুয়ার কারবারিদের আশ্রয় দিচ্ছে। আহা! কতগুলো প্রাণ চলে গেল!'

তাই, বিষমদে মৃতদের পরিবার পিছু দু-লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণের সরকারি ঘোষণা শুনে কোনও শোকার্ত মহিলা যখন বলছেন, হতদরিদ্র পরিবারটাকে ওই টাকায় দাঁড় করানোর চেষ্টা করবেন, ঠিক তখনই ক্ষিপ্ত এক মহিলার জবাব — 'কী হবে টাকা পেয়ে? আমরা দয়া ভিক্ষা চাই না। এতদিন চোলাইয়ের ঠেকগুলোকে লাই দিয়েছে পুলিশ। এখন এত মানুষ মারা যাচ্ছে, তাও প্রশাসন একটা মেডিক্যাল টিম পর্যন্ত পাঠাল না। অ্যাম্বুলেন্স নেই। ট্রেনে, ভ্যানে, অটোয় চাপিয়ে রোগী নিয়ে যেতে হচ্ছে হাসপাতালে। গরিব মানুষগুলোকে কি সরকার কোনওদিন দেখবে না?'

পুলিশ-প্রশাসন ও ক্ষমতাসীন নেতারা যে বাস্তবে কিছু করবে না, জনগণের সংঘবদ্ধ কমিটি গড়ে তোলার দ্বারাই মদ-জুয়া সহ সমাজবিরোধী ক্রিয়াকলাপ রোখা যে সম্ভব, তা দেখিয়েছে মগরাহাট নাগরিক কমিটি। এই কমিটির সক্রিয় ভূমিকার কারণেই মগরাহাট স্টেশন সংলগ্ন এলাকায় সমাজবিরোধী ক্রিয়াকলাপ অনেকখানি নিয়ন্ত্রিত। এলকায় গেলে রাস্তার দু-পাশে বাড়ি ও দোকানঘরগুলোর দেওয়ালে দেওয়ালে মগরাহাট নাগরিক কমিটির পোস্টার — 'মদের মারণযজ্ঞে যুক্ত দোষীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিতে হবে।' থানার পাঁচিলে লাগানো তাদের পোস্টারে লেখা ঃ 'প্রশাসনের নাকের ডগায় বছরের পর বছর চোলাই মদের ব্যবসা চলছে কীভাবে?' নাগরিক কমিটির সদস্য মোসলেম ফকির এ প্রসঙ্গে বললেন, পশ্চিম বিলন্দপুরের মাহিতলায় আগে মদ তৈরির ভাঁটি ছিল। ৬ মাস আগে আমাদের কমিটির উদ্যোগে সব ভেঙে দেওয়া হয়। এরপর মদ আসছে গোচরণের ভাঁটি থেকে থানার সামনে দিয়েই। গতকাল আমরা জনসাধারণকে নিয়ে স্টেশন সংলগ্ন ৮টি ঠেক ভেঙে গুঁড়িয়ে দিয়েছি। পুলিশ কোনও সহযোগিতা করেনি। কমিটির সদস্য জাকির হোসেন সরদারও থানা-পুলিশের বিরুদ্ধে উগরে দেন তাঁর ক্ষোভ, 'স্টেশনকে কেন্দ্র করে পাশাপাশি এলাকায় ব্লু ফিল্ম এবং গাঁজারও রমরমা কারবার। এগুলো তুলতে পুলিশের কোনও সহযোগিতা মেলে না। বারে বারে বলেছি, পুলিশ কিছুই করেনি।' কমিটির অপর সদস্য আব্দুল হালিম বললেন — 'আমাদের কমিটি প্রথম থেকেই অসুস্থদের হাসপাতালে পাঠানোর ব্যবস্থা করেছে। সেবামূলক কাজ হিসাবে এটা আমাদের কর্তব্য।' বললেন, 'এই মানুষগুলি কেউ জন্ম থেকেই চোলাইখোর ছিল না। এই সমাজ তাদের পিঠে ক্রমাগত মেরে গেছে চরম দারিদ্রের চাবুক, আর সামনে সাজিয়ে রেখেছে মদ-জুয়ার লোভনীয় আসর। ওদের প্রলুব্ধ করে চোলাইখোর বানালো কারা? এসব যখন ভাবি, তখন আর এই গরিব মানুষদের প্রতি অবজ্ঞা বা ঘৃণা আসে না। এদের জন্য কষ্ট হয়। ফলে, আমাদের একটা দায় তো থেকেই যায়।' মনে মনে বলি, ধন্যবাদ আপনাদের। সমাজের বঞ্চিত নিষ্পেষিত অবহেলিত মানুষের জন্য এই দায়বদ্ধতা যেন আমাদের সবার মধ্যে আরও আরও বাড়ে।

নাগরিক কমিটি পরিষ্কার দাবি তুলেছে, মদ-জুয়া-সাট্টা-ব্লু ফিল্ম কারবারিদের বিরুদ্ধে পুলিশ-প্রশাসনকে এখনই কড়া ব্যবস্থা নিতে হবে। ওদের গ্রেফতার করে এমন সাজা দেওয়া হোক যাতে অন্য কেউ এই কারবার করতে সাহস না করে।

শুধু বেআইনি মদ ব্যবসা নয়, সরকারি লাইসেন্সপ্রাপ্ত দেশি মদের ব্যবসা বন্ধ করার

সাতের পাতায় দেখুন

মগরাহাট থানায় বিক্ষোভ

মগরাহাটে বিষমদে ১৭৩ জনের মৃত্যুর প্রতিবাদে ১৫ ডিসেম্বর সারা ভারত ডি ওয়াই ও, সারা ভারত এম এস এস এবং সারা ভারত ডি এস ও-র স্থানীয় শাখা মগরাহাট থানায় বিক্ষোভ দেখায় ও ডেপুটেশন দেওয়া হয়। থানায় উপস্থিত বিডিওকেও ডেপুটেশন দেওয়া হয়।

এই প্রথম সাম্প্রতিক বিষমদ কাণ্ড নিয়ে কোনও রাজনৈতিক দল বা তাদের কোনও গণসংগঠন মিছিল করে থানা ও পুলিশ প্রশাসনের বিরুদ্ধে অভিযোগ নিয়ে থানায় বিক্ষোভ দেখাতে যাচ্ছে। স্বাভাবিকভাবেই পথের দু-ধারে মানুষ তাকে সাদর অভিনন্দন জানাচ্ছিলেন। এ যে তাদের সবার মনের কথা, বুকের ব্যথারই প্রতিধ্বনি।

স্লোগান মুখরিত মিছিল থানায় পৌঁছলে পুলিশবাহিনী তাদের গতিরোধ করে। তখন ডি ওয়াই ও-র জেলা সম্পাদক কমরেড সঞ্জয় মণ্ডলের নেতৃত্বে সাত জনের এক প্রতিনিধি দল ডেপুটেশন দিতে ভিতরে ঢোকেন। এই সময় ওসি-র পাশে উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় বিডিও এবং মগরাহাট ২নং ব্লকের পঞ্চায়েত সভাপতি। থানার গেটে তুমুল বিক্ষোভ দেখানো হয়। সেখানে সভায় ডিওয়াইও-র জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর দুই সদস্য যুব নেতা কমরেড সুমন্ত গাঙ্গুলী ও কমরেড সোমনাথ পাল, এবং এম এস এস-এর জেলা সম্পাদিকা কমরেড মাধবী প্রামাণিক বক্তব্য রাখেন।

থানা থেকে প্রতিনিধি দল বেরিয়ে এলে যুবনেতা সঞ্জয় মণ্ডল আলোচনার ফলাফল উপস্থিত জনগণের উদ্দেশে রাখেন। বলেন, ওসি, বিডিও এবং সভাপতি আশ্বাস দিয়েছেন — অবিলম্বে সর্বদলীয় আলোচনার ভিত্তিতে ধারাবাহিক প্রক্রিয়ায় বেআইনি চোলাই ব্যবসা বন্ধ করা হবে, অপরাধীদের শীঘ্রই গ্রেফতার করা হবে, এবং লাইসেন্সপ্রাপ্ত মদের দোকানগুলির লাইসেন্স বাতিল করার দাবিটি উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানানো হবে।

ভোপালের দুর্গত মানুষকে বঞ্চিত করে অলিম্পিকে টাকা ঢালছে ডাও কেমিকেলস

বিশ্বের অন্যতম মর্মান্তিক শিল্প দুর্ঘটনা ভোপালে সংঘটিত হয়েছিল ১৯৮৪ সালের ২ ডিসেম্বর। শীতল, অন্ধকার এক রাতে। ইউনিয়ন কার্বাইড কারখানা থেকে বেরিয়ে আসা বিষাক্ত 'মিক' গ্যাসে প্রাণ হারিয়েছিল সরকারি হিসাবে ৩ হাজার, বেসরকারি হিসাবে ৮-১০ হাজার মানুষ। শরীরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বিকল হয়ে পঙ্গু হয়ে গিয়েছিল প্রায় ১ লক্ষ মানুষ। গর্ভস্থ শিশুরাও রেহাই পায়নি। বহু মায়ের গর্ভপাত হয়ে গিয়েছিল। জন্মেছিল অনেক মৃত শিশু। দুর্ঘটনার পর অনেক শিশুই জন্মেছে চিরস্থায়ী বিকলাঙ্গতা নিয়ে। অথচ সামান্য জরিমানা ও কারখানার জনকয়েক কর্তার স্বল্প মেয়াদের শাস্তির বিনিময়ে পার পেয়ে গেছে ইউনিয়ন কার্বাইড। পরে এই কোম্পানিটি কিনে নিয়ে মার্কিন সংস্থা ডাও কেমিকেলস ভারত সরকারের সাথে গোপনে বোঝাপড়া করে অতি সামান্য ক্ষতিপূরণ দিয়েই দায় সেরেছে। ২৭ বছর ধরে জীবন্মৃত অসহায় অবস্থায় ধুঁকছে ভোপাল গ্যাস কাণ্ডে ক্ষতিগ্রস্ত ৫ লক্ষেরও বেশি মানুষ।

সম্প্রতি সেই ডাও কেমিকেলস আবার সংবাদের শিরোনামে। ভোপালের অসহায় মানুষের প্রতি ন্যূনতম দায়দায়িত্ব পালন করুক না করুক, গোটা বিশ্বের মানুষের চোখে নিজেদের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করার মতলবে ২০১২ সালের লন্ডন অলিম্পিকে ১২টি পার্টনারের মধ্যে অন্যতম স্পনসর পার্টনার হয়েছে ডাও কেমিকেলস। জানা গেছে, অলিম্পিক কমিটির সাথে ডাও-এর ১০ বছরের চুক্তিও হয়েছে। নির্মাণ কাজের জন্য এই কোম্পানি অলিম্পিক সংগঠকদের লক্ষ লক্ষ ডলারের রাসায়নিক জোগান দেবে।

কুখ্যাত এই ডাও কেমিকেলসকে অলিম্পিকে অর্থ সাহায্য করতে দেওয়ার বিরুদ্ধে সমালোচনায় মুখর হয়ে কর্তৃপক্ষকে ধিক্কার জানিয়েছেন বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তের শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ। প্রতিবাদ জানিয়েছেন মানবাধিকার আন্দোলনের বিশ্বখ্যাত নেতা নোয়াম চমস্কি। প্রতিবাদ না জানিয়ে পারেননি ভারত ও পাকিস্তানের বহু অলিম্পিক পদকজয়ী। বহু বিখ্যাত খেলোয়াড়, চিত্রতারকা, শিল্পী, অভিনেতা সহ সমাজের সর্বস্তরের মানুষ প্রতিবাদে সোচ্চার হয়েছেন। তাঁরা দাবি জানিয়েছেন, 'অলিম্পিকে নিজের খ্যাতি অর্জন নয়, ডাও কর্তৃপক্ষকে আগে ভোপাল গ্যাসকাণ্ডের দায় মেটাতে হবে।' নোয়াম চমস্কি সহ আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন বহু বিশিষ্ট মানুষ এবং অলিম্পিকে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে অনেকেই লন্ডন অলিম্পিকের অর্গানাইজিং কমিটির চেয়ারম্যানকে আবেদন জানিয়েছেন, ভোপালে গ্যাস দুর্ঘটনার জন্য দায়ী ডাও কেমিকেলস-এর স্পনসর পার্টনারশিপ বাতিল করতে হবে। দেশের অভ্যন্তরেও মানুষ এ ঘটনার প্রতিবাদে ফেটে পড়েছে। দেশের সর্বত্র প্রতিবাদ বিক্ষোভ সংঘটিত হচ্ছে। ভোপালে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষ ও তাদের পরিবারের সদস্যরা বিক্ষোভ মিছিলে সামিল হয়েছেন। হুইলচেয়ারে বসে মিছিলে যোগ দিয়েছেন গ্যাস দুর্ঘটনার শিকার পঙ্গু মানুষজনও।

কী ঘটেছিল ১৯৮৪ সালের ২ ডিসেম্বরের সেই ভয়ানক রাতে? সেদিন বাতাসে মৃত্যুর বার্তা টের পাওয়ার পর আচমকা ঘুম ভাঙা মানুষ বাঁচার আশায় যে যেদিকে পেরেছে ছুটেছে। বিষাক্ত গ্যাসে ঘরে বাইরে, পথেঘাটে লুটিয়ে পড়েছে, যন্ত্রণায় আর্তনাদ করেছে, ঠিকরে পড়া চোখ দিয়ে অঝোরে ঝরেছে জল। সন্তান কোলে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েছে মা। এভাবে কারখানা সন্নিহিত অঞ্চল যখন কার্যত শ্মশানে পরিণত, তখনও কিন্তু ইউনিয়ন কার্বাইড কর্তৃপক্ষ ও প্রশাসনের নিদ্রাভঙ্গ হয়নি। কারখানা কর্তারা ঘটনার পরও বলেছেন নিরাপত্তা ব্যবস্থা অটুট, ভয়ের কিছু নেই। সরকারও এগিয়ে আসেনি বিপন্ন মানুষের উদ্ধারে। উপরন্তু, রাজ্যের শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ, বিভিন্ন কলেজের ছাত্রছাত্রীরা, ছাত্র সংগঠন এ আই ডি এস ও সহ যারাই উদ্ধারকার্যে এগিয়ে এসেছিলেন, তাঁদের উপর পুলিশ লেলিয়ে দিয়েছে। ২ ডিসেম্বরের সেই ভয়াবহ দুর্ঘটনার আগেই বেশ কিছু ঘটনায় মার্কিন বহুজাতিক ইউনিয়ন কার্বাইডের প্রতি সরকারের অন্যায় পক্ষপাতের বিষয়টি পরিষ্কার হয়ে গিয়েছিল। '৮৩ সালে কারখানায় দুটি দুর্ঘটনার পরও কর্তৃপক্ষ কোনও সুরক্ষা ব্যবস্থা নেয়নি। এমনকী ১৯৮৪ সালের প্রথম দিকে কারখানার এক কর্মী রাসায়নিক অ্যালার্জিতে আক্রান্ত হয়ে মারা যান। কারণ অনুসন্ধান দূরের কথা, অভিযোগ এড়াতে তাঁর পরিবারকে রাজস্থানে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল। সরকার এই বিষয়গুলি নিয়ে সামান্যতম খোঁজখবরও করেনি। শুধু তাই নয়, দুর্ঘটনার ৪ দিন পর গ্রেপ্তার হয়েছিলেন কার্বাইড কর্তা ওয়ারেন অ্যান্ডারসন। কিন্তু আশ্চর্যজনকভাবে গ্রেপ্তারের দিনই তিনি জামিন পেয়ে যান ও ভারত ছেড়ে পালান। এর পিছনে মধ্যপ্রদেশের তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী অর্জুন সিংয়ের হাত রয়েছে বলে প্রবল অভিযোগ ওঠে। প্রতিবাদের ঝড় ওঠে দেশ জুড়ে।

ভোপাল গ্যাসকাণ্ডের পর দেশজুড়ে সমস্ত মানুষ এর জন্য কার্বাইড কর্তৃপক্ষকে দায়ী করে তাদের শাস্তির দাবি জানিয়েছিল। কিন্তু কর্তাদের শাস্তি দেওয়ার বদলে বিচারের নামে চলেছিল প্রহসন। ৭ জন কার্বাইড কর্তাকে দোষী সাব্যস্ত করে মাত্র ২ বছরের কারাদন্ড ও এক লাখ টাকা করে জরিমানা করেছিল আদালত। বিক্ষোভে ফেটে পড়ে আক্রান্ত মানুষ ও তাদের পরিবারের সদস্যরা বলেছিলেন, 'সরকারের উপর তো আমাদের কোনও আস্থাই ছিল না, এখন বিচারব্যবস্থার উপর থেকেও আস্থা চলে গেল।'

পরবর্তী সময়ে দেখা গেল, কেন্দ্র ও রাজ্যের সরকার শুধু যে বেঁকে যাওয়া শিরদাঁড়া, অন্ধ-খোঁড়া-পঙ্গু, দারিদ্রপীড়িত ক্ষুব্ধ মানুষগুলির প্রতি চরম ঔদাসীন্য আর উপেক্ষাই দেখিয়েছে তাই নয়, তাদের সঙ্গে প্রতারণাও করেছে। ভোপাল দুর্ঘটনার পর মার্কিন আদালতে মামলা করে কোম্পানির কাছে ৩৩০ কোটি ডলার ক্ষতিপূরণ দাবি করা হয়েছিল। ঘটনার ১৫ বছর পর মাত্র ৪৭ কোটি ডলার, অর্থাৎ দাবির মাত্র ১৪.২৪ শতাংশ দিতে রাজি হওয়ার শর্তেই মার্কিন কোম্পানি ও ভারত সরকারের মধ্যে আদালতের বাইরে চুক্তি হয়ে যায়। সেই সামান্য টাকাও ক্ষতিগ্রস্তদের হাতে পৌঁছায় আরও ৫ বছর পর ২০০৪ সালে। ক্ষতিগ্রস্তদের জন্য সামান্য ভাতার ব্যবস্থা করা ছাড়া সরকার দুর্গত পরিবারগুলির ছেলেমেয়েদের জন্য পড়াশুনা বা চাকরিরও কোনও ব্যবস্থা করেনি। আক্রান্তদের চিকিৎসার জন্য সুপার স্পেশালিটি হাসপাতাল খোলা হয়েছে অনেক পরে। কিন্তু সেখানে চিকিৎসা করাতে গেলে আগে প্রমাণ দিতে হয়, রোগী মারণ গ্যাসেই আক্রান্ত হয়েছিলেন। তবেই তাদের চিকিৎসা মেলে, নাহলে নয়। সরকারের 'দায়বদ্ধতা' এতখানি যে, ঘটনার ২৭ বছর পরেও সেখানকার মানুষ বিষাক্ত জল পান করতে বাধ্য হচ্ছে, কোনও বিকল্প জলের ব্যবস্থাটুকুও এখনও পর্যন্ত করা হয়নি!

জনগণের প্রতি উদাসীনতা যতই নির্মম হোক না কেন বহুজাতিক ডাও কেমিকেলস-এর ক্ষেত্রে সরকারি দাক্ষিণ্যে এতটুকুও কার্পণ্য দেখা যায়নি। এ ব্যাপারে পিছিয়ে নেই কংগ্রেস, বিজেপি এমনকী সিপিএম-ও। ডাও যাতে অন্য নাম নিয়ে ব্যবসা চালিয়ে যেতে পারে, সে বিষয়ে সরকারের অনেক রাঘববোয়ালের সরাসরি হস্তক্ষেপ ছিল। ১৯৮৪ সালে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধীর সময়ে অভিযুক্ত কার্বাইড কর্তা অ্যান্ডারসন ভারত ছাড়তে পেরেছিল নির্বিঘ্নে। বিজেপির পাঁচ বছরের শাসনেও ভোপালকাণ্ডে দোষীদের কোনও শাস্তি হয়নি। ইউ পি এ-র শরিক থাকাকালীন সিপিএম-কেও বিচারের দাবিতে সরব হতে দেখা যায়নি। প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং একবার মন্তব্য করেছিলেন, 'এরকম ভোপাল আরও ঘটবে, কিন্তু তাই বলে দেশের অগ্রগতি তো থেমে থাকতে পারে না'। অর্থাৎ আরও এ ধরনের নির্মম দায়িত্বজ্ঞানহীনতার পরিচয় দেবে কারখানার মালিকরা, অসহায়ভাবে মৃত্যু ঘটবে মানুষের, লক্ষাধিক মানুষ পঙ্গু হবে। তার বিনিময়ে স্বল্পসংখ্যক পুঁজিপতির উন্নয়নের রথ তরতর করে এগিয়ে যাবে। জনসাধারণের প্রাণের বিনিময়ে বিপুল মুনাফা হবে পুঁজিমালিকদের। এ থেকেই পরিষ্কার, দেশি-বিদেশি মাল্টিন্যাশনালগুলির সাথে এ দেশের শাসকদলের ঘনিষ্ঠতা কতখানি গভীর। তাই মনমোহন সিং প্রধানমন্ত্রী থাকাকালে ডাও কেমিকেলস অনায়াসে তাদের জন্য কী কী করতে হবে সে ব্যাপারে সরকারকে নির্দেশ দিতে পারে। মুনাফালোভী দেশি-বিদেশি কর্পোরেট সংস্থাগুলির সাথে শাসক রাজনৈতিক দল, প্রশাসন, বিচারবিভাগের একটি অশুভ চক্র বর্তমানে কীভাবে দেশের প্রকৃত নিয়ন্ত্রক হয়ে উঠেছে, এসব ঘটনার মধ্য দিয়েই তা একেবারে নগ্ন হয়ে গিয়েছে।

২৭ বছর কেটে গেছে, ভোপাল গ্যাসকাণ্ডে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষগুলির অসহনীয় ক্ষতের সামান্য নিরাময়ও হয়নি। এ বছরও ৩ ডিসেম্বর আবার পালিত হয়েছে গ্যাস দুর্ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্তদের স্মরণদিবস। কিন্তু এখনও এ দেশের আকাশে বাতাসে ধ্বনিত হচ্ছে ভোপালের অসহায় সেই মানুষগুলোর প্রশ্ন — অন্যের ভুলের মাসুল কেন তাদের সারাজীবন ধরে দিয়ে যেতে হবে? কার দোষে বিকলাঙ্গ সন্তানের জন্ম দিতে হবে মা-কে? কেন পরিশ্রমী মানুষগুলোর কাছ থেকে ছিনিয়ে নেওয়া হবে খেটে খাওয়ার সামর্থ্য? মানুষ জানতে চায়, এই মর্মান্তিক ঘটনার প্রতিকারে সরকার কী ব্যবস্থা নিয়েছে, ক্ষতিপূরণই বা কী দিয়েছে। শুধু সরকারি আশ্বাসবাণী শুনতে শুনতে দিন গুজরান করা আর তিল তিল করে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যাওয়া— এই তো তাঁদের ভবিতব্য!

তবুও ভোপালের দুর্গত মানুষ বেঁচে থাকার আশা ছাড়েননি, মনোবল হারাননি লড়াই করার। তাঁরা অভিযুক্তদের শাস্তির দাবিতে এবং ক্ষতিপূরণের দাবিতে মিছিলে-ধর্নায় সামিল হয়েছেন। আজও চলছে প্রতিবাদ। গোটা দেশের মানুষের সাথে সাথে বিশ্বের শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষও তাঁদের এই লড়াইয়ের সহযোদ্ধা। তাই লন্ডন অলিম্পিকে ঢালাও অর্থ জোগান দেওয়ার ডাও কেমিকেলসের এই নতুন খেলার প্রতিবাদে আজ মুখর সারা বিশ্ব।

ঝাড়খণ্ডে অঙ্গনওয়াড়ি কর্মচারীদের দাবি আদায়

অঙ্গনওয়াড়ি কর্মচারীদের সরকারি কর্মচারীর স্বীকৃতি দেওয়া, আই সি ডি এস স্কিম উন্নত করা, মাতৃত্বকালীন ছুটি ঘোষণা করা, কেন্দ্রীয় সরকারের বর্ধিত বেতন রাজ্যে দেওয়া এবং কেন্দ্রগুলিতে সরকারি বাড়ি তৈরি করা ইত্যাদি ১২ দফা দাবিতে সংগঠিত আন্দোলন গড়ে তুলেছিলেন এ আই ইউ টি ইউ সি অনুমোদিত ঝাড়খণ্ড অঙ্গনওয়াড়ি কর্মচারী সমিতি। ১২ ডিসেম্বর জে এ কে এ-র নেতৃত্বে হাজার হাজার অঙ্গনওয়াড়ি কর্মচারী রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর অফিসের সামনে বিক্ষোভ সমাবেশে যোগ দেন। বক্তব্য রাখেন এ আই ইউ টি ইউ সি-র সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য, জে পি এ-র সভাপতি কমরেড অচিন্ত্য সিনহা, ঝাড়খণ্ড জে এ কে এ-র সম্পাদক কমরেড সুমিত রায় সহ পুষ্প মাহাত। এক প্রতিনিধি দল মুখ্যমন্ত্রীর অনুপস্থিতিতে তাঁর অফিসে দাবিপত্র পেশ করেন। পরে সরকারের পক্ষ থেকে ঘোষণা করা হয় যে, এক সপ্তাহের মধ্যে অঙ্গনওয়াড়ি কর্মচারীদের বেতন বাড়ানো হবে এবং ১৫ দিনের মধ্যে নারী ও শিশু বিকাশমন্ত্রী নেতৃত্বের সাথে বসে অন্যান্য দাবিগুলি নিয়ে কথা বলবেন। সভাস্থল থেকে অঙ্গনওয়াড়ি কর্মচারীদের বিশাল মিছিল শহরের পথ পরিক্রমা করে। বিএমএস পরিচালিত ইউনিয়নের সদস্যরা তাঁদের ইউনিয়ন থেকে পদত্যাগ করে জেএকেএ-তে যোগ দিচ্ছেন।

বিষমদ

ছয়ের পাতার পর

দাবিতেও মানুষ রুখে দাঁড়াচ্ছেন। গড়ে তুলছেন প্রতিরোধ। এলাকায় এলাকায় মৌনমিছিল হচ্ছে মাদক বর্জনের ডাক দিয়ে। কিন্তু, এই জনমানসিকতাকে সংঘবদ্ধ করে দীর্ঘস্থায়ী প্রতিরোধ আন্দোলনের রূপ দিতেই হবে। না হলে, স্বতঃস্ফূর্ত এই মানসিকতা বেশিদিন ধরে রাখা সম্ভব নয়। অল ইন্ডিয়া ডিওয়াইও, অল ইন্ডিয়া এমএসএস এবং অল ইন্ডিয়া ডিএসও পোস্টার দিয়ে আহ্বান জানিয়েছে, ' পুলিশি মদতে চোলাই মদের রমরমার বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তুলুন।' অন্যান্য বারের মতো কিছুদিনের মধ্যেই প্রচারমাধ্যম এ বিষয়ে নীরব হয়ে যাবে এবং রাজ্যবাসীও হয়তো ভুলে যাবে এত গরিব মানুষের এমন মর্মান্তিক মৃত্যুর আতঙ্ক। সেই সুযোগে রাজনৈতিক মতলববাজ ও মাসোহারা খাওয়া পুলিশের সম্মিলিত প্রয়াসে আবার সেলিম ও খোঁড়া নূর, রবিয়ল-রা সাম্রাজ্য সাজিয়ে বসবে।

কিন্তু, আমরা কি এই যন্ত্রণাময় অভিজ্ঞতাকে ভুলে যাবো? আবার কোনও সময় রাজ্যে বিষমদে মৃত্যুর ঘটনা ঘটলে কেবল তখনই কি আমরা '২০১১-র ডিসেম্বর, দক্ষিণ ২৪ পরগণায় বিষমদে ১৭৩ জনের মৃত্যু'র তথ্য ভাণ্ডার হাতড়ে বের করবো? যেমনটি এখন করা হচ্ছে। নাকি মগরাহাট নাগরিক কমিটির ওই সদস্যের মতো আমরাও বুকের অন্তঃস্থলে অনুভব করব যে, 'আমাদের একটা দায় তো থেকেই যায়'? সেই দায়বদ্ধতা থেকে বেআইনি ও লাইসেন্সপ্রাপ্ত সর্ববিধ মাদক দ্রব্যের বিরুদ্ধে অভিযানে আমরা যেন সক্রিয় ভূমিকা নিতে পারি, রাজ্যের মানুষের মধ্যে এই অভিযানকে যেন সর্বদা জাগরূক রাখতে পারি, এবং রাজ্যবাসীকে মাদকবিরোধী সংঘবদ্ধ দীর্ঘস্থায়ী অভিযানে সামিল করানোর ক্ষেত্রে দায়িত্ব পালন করতে পারি।

হাওড়ায় ফুলচাষিদের বিক্ষোভ

আগামী বর্ষার পূর্বে হাওড়া জেলার মধ্য দিয়ে বয়ে যাওয়া মেদিনীপুর ৭ নম্বর ক্যানেলের পূর্ণ সংস্কার, সরকারি উদ্যোগে বাগনানের ফুল বাজার ও বহুমুখী হিমঘর নির্মাণের কাজ দ্রুত শেষ করা, গত বর্ষায় ক্ষতিগ্রস্ত সমস্ত কৃষকদের অবিলম্বে উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ প্রদান সহ ফুলচাষিদের বিভিন্ন দাবিতে জেলা ফুলচাষি ও ফুল ব্যবসায়ী সমিতি এবং কৃষক ও খেতমজুর সংগঠনের উদ্যোগে হাওড়া জেলার অতিরিক্ত জেলাশাসক (উন্নয়ন) , জেলা পরিষদের সভাধিপতি, জেলা হর্টিকালচার আধিকারিকের নিকট ১ ডিসেম্বর স্মারকলিপি দেওয়া হয়। ঐ কর্মসূচি উপলক্ষে জেলাশাসক ও জেলা পরিষদ অফিস চত্বরে বিক্ষোভ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় বক্তব্য রাখেন সারা বাংলা ফুলচাষি ও ফুল ব্যবসায়ী সমিতির সম্পাদক নারায়ণচন্দ্র নায়ক, সমিতির জেলা সভাপতি গোপাল চন্দ্র খাঁড়া, সম্পাদক শ্রীমন্ত খাঁড়া, কৃষক ও খেতমজুর সংগঠনের পক্ষে নিখিলরঞ্জন বেরা, প্রলয় কুমার মাইতি। আধিকারিকবৃন্দ দাবিগুলির যৌক্তিকতা স্বীকার করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের আশ্বাস দেন।

অন্যদিকে পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর এবং হাওড়া জেলার ৬ নম্বর জাতীয় সড়ক ধরে বাসযোগে যে ফুল মল্লিকঘাট ফুল বাজারে আসে সেই ফুলের বোঝা সিগন্যাল মোড়ে নামানোর ক্ষেত্রে হাওড়া ট্রাফিক পুলিশ কর্তৃক হেনস্থার প্রতিবাদেও পৃথকভাবে স্মারকলিপি পেশ করা হয়।

R.N.I. No 5268 / 60
Postal Registration No. KOL / RMS / 138 / 2010-12

হারানো জমি লড়াই করেই উদ্ধার করতে হবে

সিঙ্গুরের চাষিদের অভিমত

২ ডিসেম্বর ২০০৬। এ দেশের কৃষি-জমি রক্ষা আন্দোলনের এক ঐতিহাসিক দিন। টাটার কারখানার জন্য জমির দখল নিতে সিপিএম সরকার সেদিন পৈশাচিক অত্যাচার চালিয়েছিল সিঙ্গুরের চাষিদের উপর। শিউরে উঠেছিল সারা দেশের মানুষ। এই দিনটি 'সিঙ্গুর দিবস' হিসাবে চিহ্নিত হয়ে গেছে আন্দোলনকারী মানুষের মনে।

তার পর কেটে গেছে পাঁচটি বছর। রাজ্যে সরকার পাল্টেছে। আজ কেমন আছেন সিঙ্গুরের মানুষ? ২০১১-র ২ ডিসেম্বর সিঙ্গুর দিবসে সেই প্রশ্ন নিয়ে 'গণদাবী'র পক্ষ থেকে প্রতিবেদকরা উপস্থিত হয়েছিলেন সিঙ্গুরের মানুষের কাছে।

৪০০ একর জমি ফেরতের দাবিতে দীর্ঘদিন ধরে আন্দোলন চালাচ্ছিলেন সিঙ্গুরের যে অনিচ্ছুক কৃষকরা রাজ্যে সরকার পরিবর্তনের পর তাঁরা আশা করেছিলেন, খুব শীঘ্রই জমি ফেরত পাবেন। তৃণমূল সরকার ১৩ জুন বিধানসভায় 'সিঙ্গুর পুনর্বাসন ও উন্নয়ন বিল' নামে একটি বিল পাশ করিয়ে অনিচ্ছুক চাষিদের জমি ফেরৎ দেওয়ার জন্য আইন জারি করে। আইন পাশ হতেই আইনের বিধি বিধান নিয়ে জটিলতা দেখা দেয়। আইনের বিরুদ্ধে টাটারা কোর্টে মামলা দায়ের করে। সেই মামলার নিষ্পত্তি এখনও হয়নি। সিঙ্গুরের মানুষ কোর্টের দিকে তাকিয়ে বসে আছেন। অনেকেই হতাশাচ্ছন্ন। এ দিন তাঁরা স্মরণ করলেন আন্দোলনমুখর সেই দিনগুলির কথা । বাজেমেলিয়া গ্রামের জয়ন্তী খাঁড়া বললেন, 'তখন প্রতিদিন মিছিলে যেতাম। যতদিন জমি ফেরত না পাই ততদিন আগের মতই রান্না-বান্না, ঘরের কাজ ফেলে রেখে মিছিল করতে রাজি আছি'। বললেন, 'এস ইউ সি আই (সি)-র ছেলেমেয়েরা দিনের পর দিন আমাদের বাড়িতে থেকেছে, খেয়েছে। কত বুঝিয়েছে আমাদের। পুলিশ এসেছে শুনে রান্না ফেলে, উনুনে জল ঢেলে ছুটেছি। মন্ত্রীদের কালো পতাকা দেখাতে গিয়ে এস ইউ সি-র ছেলেমেয়েরাই মার খেয়েছিল।'

টাটার পাঁচিলের কাছে ছোট্ট মুদির দোকান প্রবীর দাসের। এই পরিস্থিতি দেখে খুব বিরক্ত, হতাশ তিনি। বললেন, 'কিছু ভাল লাগে না, দোকান করে কোনও রকমে সংসার চালাই। কী করে যে দিন যায় তা আমরাই জানি'। জমি চলে যেতে কারও কারও ভরসা দরজির কাজ। কাজ থাকলে আয় হয়, না হলে হয় না। আবার উত্তর বাজেমেলিয়ার পুলিনবিহারী মালিকের কণ্ঠে ফুটে উঠল সেদিনের আন্দোলনের সেই তেজ। দেড় বিঘা জমির সবটুকুই গেছে টাটার দখলে। বাড়ি-ঘরের অবস্থা ভেঙে পড়ার মতো। আগে ধান, আলু, পাট, সবজি সবই হত। সংসারে আয়ও হত ভাল। এখন 'দিন আনি দিন খাই' অবস্থা।

রাজ্যে সরকার পরিবর্তনের উপরেই প্রথমে ভরসা করেছিলেন বলে জানালেন মহিলারা।

— সেই ভরসাতেই কি আপনারা নির্বাচনে জেতার দিনই মিছিল করে জমির দখল নেননি?

প্রশ্নের উত্তরে হরিমোহন বারিকের বাড়িতে জড়ো হওয়া মহিলা পুরুষ একযোগে বলে ওঠেন, সে ভরসা আর থাকছে কই? টাটা যদি জেতে আমাদের তো কিছুই থাকবে না! এত লড়াই করলাম, মার খেলাম, জমি গেছে তবু ক্ষতিপূরণ নিইনি, কোর্ট কাছারির সুযোগ না দিয়ে নিজেদের জমির দখল নিতে পাঁচিল ভাঙাই ঠিক কাজ ছিল।

এ বছরেও সিঙ্গুর দিবসে ওরা আশা করেছিলেন অন্যান্য বারের মত তৃণমূলের রাজ্য নেতারা আসবেন, মুখ্যমন্ত্রীও আসবেন। কিন্তু কেউ এলেন না দেখে ওদের চোখে মুখে হতাশা। ঐ দিন কৃষিজমি রক্ষা কমিটির উদ্যোগে বাজেমেলিয়া বাজারে একটি পথসভা হয়। সভায় তৃণমূল কংগ্রেসের স্থানীয় নেতৃবৃন্দ সহ বক্তব্য রাখেন এস ইউ সি আই (সি) ও কৃষক-খেতমজুর সংগঠনের নেতা কমরেড মদন ঘটক।

তাই বারিক বাড়ির প্রবীণ সদস্য হরিমোহনবাবু ক্ষোভের সাথে বললেন, 'সরকারে গিয়ে সিঙ্গুরকে এরা ভুলে গেছে।' জ্যোৎস্না বারিক, স্বপ্না খাঁড়া ঐ বাড়ির দাওয়ায় বসে শোনালেন তাঁদের অভাব-অভিযোগ, দিন যাপনের করুণ কাহিনী। বললেন, 'জমি না দিলে আমাদের চাকরি দিক অন্তত। জঙ্গলমহলে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলছেন দশ হাজার লোকের চাকরি দেবেন। এখানে অন্তত এক হাজার লোককে চাকরি দিক'। ক্ষোভ ঝরে পড়ছিল তাঁদের চোখেমুখে।

সুলেখা দাসের তিন কাঠা জমি ছিল। সংসার মোটামুটি চলে যেত। জমি চলে যাওয়ায় অতি কষ্টে বৈদ্যবাটিতে রাস্তা কাটার একটা কাজ জোগাড় করেছেন স্বামী পরীক্ষিৎ দাস। ছেলে কলেজে পড়ছে। অসুস্থ বাবার উদয়াস্ত পরিশ্রম দেখে সে পড়া ছেড়ে দেওয়ার কথা ভাবছে। মা চোখের জল ফেলতে ফেলতে বললেন, 'যে কোনও একটা কাজ জোগাড় করে দাও তোমরা। জমি নেই, খাব কী? কত লড়াই করলাম। শুধু বাঁচার জন্য। কিন্তু এ সরকার এসে কী করল! জমি ফেরতের জন্য আবার আমরা দিনরাত মিছিল মিটিং করব।'

গ্রামের মানুষ কেউ কেউ বললেন, শুনেছি বামফ্রন্ট সরকার টাটার জমির পাহারাদারদের চাকরি চলে যাওয়ার জন্য ক্ষতিপূরণ দিয়েছে। আমাদের জমি চলে গেছে, যতদিন জমি না পাই আমাদের ক্ষতিপূরণ দেবে না কেন?

সিঙ্গুরের গ্রামে গ্রামে আজ একই কথা। দুপুরের দিকে গ্রামের পুরুষরা মাঠ থেকে ফিরলে মহিলাদের সাথে তাঁরাও যোগ দিলেন অসীমা খাঁড়ার বাড়িতে। জমি চলে যাওয়ায় কেমন আছেন— অসীমা খাঁড়াকে প্রশ্ন করতেই যেন জমে থাকা দুঃখ-বেদনার বিস্ফোরণ ঘটল। বললেন, 'কোনও কিছুতেই শান্তি পাই না, আমাদের কাছে দোল, দুর্গোৎসব, আত্মীয় কুটুম্ব কোনও কিছুরই যেন কোনও মানে নেই'। যমুনা পাত্র কাঁদতে কাঁদতে বললেন, 'কীসের পরিবর্তন? আমাদের জীবনে তো কোনও পরিবর্তন এলো না! অবস্থা আরও খারাপ হয়েছে। এই সরকার, আগের সরকার সকলেই হাতে নয়, ভাতে মারছে'। ৬৮ বছরের চন্দ্রময়ী পাত্রকে দেখলে বোঝা যায় না তিনি কোনওদিন আন্দোলন কথাটা শুনেছেন। কিন্তু বাঁচার তাগিদে জমি রক্ষার লড়াইয়ে নেমেছিলেন, ছিলেন প্রথম সারিতে। বললেন, 'দিদি কি একবারও ভাববেন না ছেলেমেয়েদের আমরা কী খেতে দেব?'

অল্পবয়সী গৃহবধূ টুসি খাঁড়া কোর্ট কেসের এই অচলাবস্থায় ভীষণ ক্ষুব্ধ। আন্দোলনের তেজ তার মধ্যে এখনও একইভাবে আছে। তিনি সোজাসাপ্টা বলে দিলেন, 'তাপসী মালিকের জীবনের বিনিময়ে মুখ্যমন্ত্রী হয়েছেন মমতা ব্যানার্জী। এখন বলছেন, শুধু সিঙ্গুর আন্দোলনের জন্য তিনি জেতেননি। আমরা সিঙ্গুরের মানুষ এই কথা কিছুতেই মেনে নিতে পারছি না'।

নিজেদের জমি ছিল না, তবুও প্রতিদিন আন্দোলনে ছিলেন লতিকা মণ্ডল, সাবিত্রী পাত্ররা। ভাগে চাষ করতেন, কিন্তু বর্গাদার হিসাবে নাম নথিভুক্ত ছিল না। ফলে শহরবাসী জমির মালিকরা ক্ষতিপূরণ নিয়ে নিলে এঁরা পথে বসেন। এই পরিবারগুলির বর্তমান অবস্থা প্রায় ভিক্ষুকের মতো। কোনওরকমে আলু তুলে, বেচে সংসার চলে। বাড়িতে জানালা নেই, দরজা নেই। ছেলেমেয়েদের কী খেতে দেবে ঠিক নেই।

দোবাদি গ্রাম গরিব খেতমজুর অধ্যুষিত। লড়াই করে বামফ্রন্ট সরকারকে এরা হারিয়েছে। কিন্তু তারা যে তিমিরে ছিল সেই তিমিরেই পড়ে আছে — এ অভিযোগ ঘরে ঘরে। সিঙ্গুরের যে জমিতে তারা দিনমজুরি করত সে সব জমি টাটার পাঁচিলের ভিতর। তাই স্বভূমি ছেড়ে তারা পাড়ি দিতে বাধ্য হয় অন্যত্র, কাজের জন্য হা-পিত্যেশ করে বসে থাকতে হয়। এস ইউ সি আই (সি) যখন বলে একমাত্র চাষি আন্দোলনের মধ্য দিয়েই তাদের নিজেদের জমি ফিরে পেতে পারে, অন্য কোনও উপায়ে নয়, তখন এইসব দিনমজুর বা সামান্য কয়েক কাঠা জমির মালিক গরিব চাষি পরিবারগুলি তাদের নিজস্ব বাস্তব অবস্থা থেকে কথাটা পরিষ্কার বুঝতে পারে।

গত ৫ আগস্ট কলকাতায় এক জনসভায় দলের সাধারণ সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ বলেছিলেন, ''এখন তো সরকারে আছে তৃণমূল। সরকারে থেকে ওরা কী করছে? উচিত ছিল গোটা হুগলি জেলার কৃষক ও গরিব মানুষকে সংঘবদ্ধ করে পাঁচিল ভেঙে টাটার জমি দখল করা। পূর্বতন সিপিএম সরকার জমি দখল করেছে ব্রিটিশ আমলের একটি ঔপনিবেশিক মধ্যযুগীয় আইনের জোরে। কেন গণআন্দোলনের জোয়ার তুলে জমি দখলের পথে ওরা গেল না? পুলিশ-প্রশাসন তো ওদেরই। আর এই আন্দোলন তো ন্যায়সঙ্গত হত। আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে গায়ের জোরে একটা সরকার টাটার স্বার্থে আমার জমি কেড়ে নিয়েছে সেই জমি পুনরুদ্ধার করা কি অপরাধ? কিন্তু বুর্জোয়া 'আইন শৃঙ্খলা রক্ষার' দৃষ্টিতে এটা অপরাধ।''

একথা শুনে সমবেত চাষিরা বললেন, এটাই তো ঠিক কথা। বাজেমেলিয়ার পুলিনবিহারী মালিক খানিকটা দৃঢ়ভাবেই জানিয়ে দিলেন, ' যে ভুল হয়ে গেছে তা তো হয়েই গেছে। এখন টাটারা যদি জেতে তাহলে আমরা পাঁচিল ভেঙেই আমাদের জমি দখল করে নেব।' টাটার মত শক্তিশালী কর্পোরেট পুঁজির মালিক এই নিরস্ত্র কৃষক, খেতমজুর, দিনমজুর পরিবারগুলির মহিলা, পুরুষ, বৃদ্ধ, কিশোর, শিশুদের ঐক্যবদ্ধ লাগাতার আন্দোলনে পিছিয়ে যেতে বাধ্য হয়েছে। সিঙ্গুরের বিশেষ করে মহিলাদের প্রতিরোধ সারা বাংলার কৃষক তথা শ্রমজীবী জনগণকে চিনিয়ে দিয়েছে জনগণের সংগ্রামী দৃঢ় প্রত্যয়। চাষি ঘরের মা বোনেরা ভীরু, লাজুক; ঘোমটার আড়াল থেকে তারা বেরিয়ে আসতে পারবে না কোনওদিন— এই ছিল সাধারণ ধারণা। কিন্তু আড়ষ্ট, ঘরকুনো, চোখের জলে অদৃষ্টকে মেনে নেওয়া সেইসব মা-বোনেরাই দেখিয়ে দিলেন, জীবনের সত্যিকারের প্রয়োজনে লড়াইয়ের ময়দানে তাঁরা কী বীরত্ব, আত্মত্যাগ, সাহস ও তেজের পরিচয় দিতে পারেন। সেই তেজোদীপ্ত শিখা আজও দেখতে পাওয়া যায় সিঙ্গুরের গ্রামে গ্রামে মানুষের চোখেমুখে। অধিকার আদায়ের লড়াই-ই এই মানুষগুলিকে আজও জাগিয়ে রেখেছে। দাবি আদায় না হওয়া পর্যন্ত তারা লড়াই-এর রাস্তা ছাড়বে না— এই অঙ্গীকার তাদের চোখে মুখে। 'সিঙ্গুর দিবস' তাদের কাছে এই আহ্বান নিয়ে এসেছে।

কালো টাকার কারবারিদের আড়াল করা চলবে না

লোকসভায় ডাঃ তরুণ মণ্ডল

১৪ ডিসেম্বর লোকসভায় কালো টাকার উপর আলোচনায় অংশ নিয়ে ডাঃ তরুণ মণ্ডল বলেন, আজ যাঁরা কেন্দ্রীয় সরকারে আছেন এবং যাঁরা এখন বিরোধী পক্ষে, উভয়েরই কালো টাকা উদ্ধারের প্রশ্নে কোনও বিশ্বাসযোগ্যতা নেই। স্বাধীনতার পর কেন্দ্রের সরকারে অধিকাংশ সময় থেকেছে যে কংগ্রেস, তারাও কিছু করেনি, আবার এন ডি এ-ও পাঁচ বছর ক্ষমতায় থেকে কিছু করেনি। ইউ পি এ-১ বা সিপিএম সিপিআইয়ের সমর্থনপুষ্ট যুক্তমোর্চার সরকারও কালো টাকা নিয়ে উচ্চবাচ্য করেনি।

সকল বক্তাই দেশের নির্বাচনে কালো টাকার যুক্ত থাকার কথা স্বীকার করেছেন। শুধু নির্বাচন নয়, দেশের সিনেমা শিল্প থেকে খেলাধূলা — সব ক্ষেত্রেই কালো টাকার দাপট চলে। আর, নির্বাচনী প্রক্রিয়ায় কালো টাকা যুক্ত থাকার ফলে বড় বড় পার্টিগুলোর নির্বাচনী তহবিলেও কালো টাকা জমা হয়। আমি চাই, এই লোকসভায় দাঁড়িয়ে প্রতিটি রাজনৈতিক দলের নেতৃত্ব ঘোষণা করুন যে, তাঁরা কখনও শিল্পপতি, বড় বড় ব্যবসায়ী, মাল্টিন্যাশনাল ও কর্পোরেট পুঁজিপতিদের কাছ থেকে টাকা নেবেন না।

সরকার যদি যথার্থই এ ব্যাপারে আন্তরিক হয় তবে তারা অর্ডিন্যান্স করুন, আইন আনুন যাতে কালো টাকার কারবারিদের বিরুদ্ধে সরকার কঠোর ব্যবস্থা নিতে পারে। কালো টাকার বিষয়ে সরকারের অবশ্যই উচিত শ্বেতপত্র প্রকাশ করা। এই কালো টাকার প্রভাবে মূল্যবৃদ্ধি ঘটলে, তার চাপ তো জনগণের উপরই পড়ে। এও আমরা সরকারি দলের লোকদের মুখ থেকেই শুনেছি যে, আমাদের দেশে বিদেশি পুঁজি বিনিয়োগের অধিকাংশই এমন সব পথে আসছে, যেখানে কর ফাঁকি দেওয়া যায়। সরকারকে তো এইসব পথ বন্ধ করতে হবে। হাসান আলি নামে যাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে, তার পরিচয় কী? তার পিছনে কারা আছে? এইসব ব্যক্তিদের আড়াল করছে কোন রাজনীতিকরা?

ইতিপূর্বে প্রশ্নোত্তর পর্বেও আমি মাননীয় মন্ত্রীকে বলেছিলাম, বিদেশে পাচার হওয়া ভারতীয় বিপুল পরিমাণ কালো টাকা ফিরিয়ে আনার ব্যবস্থা করার জন্য। কিন্তু সরকার এখনও কিছুই করেনি। কারা এভাবে টাকা পাচার করেছে, তাদের নামগুলোই বা কেন প্রকাশ করা হচ্ছে না? এ দেশের ব্যাঙ্কগুলিতেও অনেকেরই কালো টাকা জমা আছে। বিভিন্ন সংবাদপত্র সে কথা প্রকাশও করেছে। এক্ষেত্রেও সরকার নিষ্ক্রিয় কেন? এই নিষ্ক্রিয়তা বন্ধ করে সরকারের এখনই জরুরি ভিত্তিতে তৎপর হওয়া দরকার।

● ভয়াবহ মূল্যবৃদ্ধি ● সার-বীজ-কীটনাশকের দাম বৃদ্ধি ● পাশ-ফেল প্রথা তুলে দেওয়া ● গণতান্ত্রিক অধিকার হরণ ● সীমাহীন দুর্নীতি ● নারী ও শিশু পাচার, নারী লাঞ্ছনার বিরুদ্ধে এবং ● কর্মচ্যুত শ্রমিক-কর্মচারি ও বেকারের কর্মসংস্থান ● সরকারি দায়িত্বে সকলের চিকিৎসা ● চাষির ফসলের ন্যায্য দামের দাবি সহ
কেন্দ্রীয় সরকারের জনবিরোধী নীতির প্রতিরোধে
কোটি কোটি মানুষের স্বাক্ষরিত স্মারকলিপি সহ
মার্চ মাসে পার্লামেন্ট অভিযান
দাবিপত্রে আপনার স্বাক্ষর দিন

সম্পাদক মানিক মুখার্জী। ফোন ঃ সম্পাদকীয় দপ্তর ঃ ২২২৭১৯৫৪, ২২২৬০২৫১ ম্যানেজারের দপ্তর ঃ ২২৬৫৩২৩৪ ফ্যাক্স ঃ (০৩৩) ২২৬৪-৫১১৪, e-mail : ganadabi@gmail.com Website : www.suci-c.in
মানিক মুখার্জী কর্তৃক এস ইউ সি আই (সি) পঃ বঃ রাজ্য কমিটির পক্ষে ৪৮ লেনিন সরণী, কলকাতা-১৩ হইতে প্রকাশিত ও গণদাবী প্রিন্টার্স অ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ৫২বি ইন্ডিয়ান মিরর স্ট্রিট, কলকাতা-১৩ হইতে মুদ্রিত।